স্নেহের বন্ধন

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)
[বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড]
কলিকাতা—১

প্রকাশক :—
শ্রীরাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত
"রাজেন্দ্র লাইব্রেরী"
১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)
[বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড]
কলিকাতা—১

এই লেখকের অন্যান্য বই

ভালবাসা
ফুলশয্যা
ফুলশয্যার রাতে
সেদিন দুজনে
শুভলগ্ন
অনুরাগ
তোমার সংসার

মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রক :—
শ্রীমাধবলাল দত্ত
"রঘুনাথ ষ্টেশনারী প্রাঃ লিঃ"
২৪এ, বাগমারী রোড
কলিকাতা—৫৪

স্নেহের বন্ধন

SNEHER BANDHAN

A Bengali Novel

By : Bidhayak Bhattacharya.

Price—Rs. 3·00

॥ এক ॥

কোলকাতায় হোষ্টেলে থেকে—উনা মিশ্র ডিগ্রী কোর্সে পড়ে। গরমের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। বাড়ি ওদের বিহারে। মধুপুর ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়। প্রায় তিন মাইল গেলে উঁচু-নীচু পাহাড়ী প্রান্তরের মাঝখানে ছবির মতো একটি গ্রাম। বেশ বড় গ্রাম। লম্বায় প্রায় দু' মাইল, চওড়ায় দেড় মাইলের কিছু বেশী। এই গ্রামের উত্তর প্রান্তে প্রকাণ্ড একটি বাড়ি। উনা এই বাড়ীর মেয়ে।

এখন মিশ্র, কিন্তু আসলে ওঁরা মিশির ব্রাহ্মণ—কনৌজাগত। এককালে বেশ বড় জমিদার ছিলেন। এখন অবস্থা পড়ে এসেছে, কিন্তু খারাপ নয়। বাড়ির মধ্যে বাস করে তিন চারটি প্রাণী। উনার বাবা শংকর মিশ্র। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। দুটোর বেশী তিনটে কথা কেউ বলতে পারে না ভয়ে। আর একটি মহিলা থাকেন বাড়িতে—উনার মাসীমা। বয়স হবে বছর পঁয়ত্রিশ। তিনিও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ছেলে-বেলায় উনার মা মারা যাবার পর এই মাসী ললিতা দেবী এসে সংসারের হাল ধরেন। আর আছে একটি বৃদ্ধ চাকর—সাধন। আরো একজন বাড়িতে থাকে—সে হচ্ছে এবাড়ির ঝি—সাঁওতাল মেয়ে—মনিয়া তার নাম। উনার বয়স কুড়ি-একুশ। মনিয়ার বয়স পঁচিশ।

শোনা যায় একদিন ঝড়-জলের রাত্রে ষোল বছরের মনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে শংকর মিশ্র বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। বলেন—মাঠের মাঝখানে বাজ পড়ে ওর বাবা মা দুজনেই মারা গেছে। তাদের পাশে বসে কাঁদছিল মনিয়া। বাড়ি ফিরছিলেন শংকর। দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এসেছেন গাড়ীতে।

উনা চিরকালই বাইরে বাইরে থেকেই বোর্ডিংয়ে কেটেছে তার জীবন। ছুটি-ছাটাতে এসেছে বাড়িতে। কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে গেছে পড়ার জায়গায়। ম্যাট্রিক পাস করে সে কোলকাতায় এসেছে কলেজে পড়তে।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দোতলার ঘরের উত্তর দিকে জানালার কাছে উনা চুপ করে বসেছিল। ওদের বাড়ির পরেই প্রকাণ্ড একটা প্রান্তর। মাইলখানেক দূরে আবার পাহাড় শুরু। বৈশাখের উদাস অপরাহ্নবেলায় কিছুই যেন আর ভাল লাগে না।

কাকার কথা মনে পড়ছে ওর। অঙ্কুর মিশ্র। অত্যন্ত রূপবান, অত্যন্ত চঞ্চল, অতিশয় মেজাজী মানুষ তার কাকা। প্রায় পাঁচ ছ' বছর কাকার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। ছেলেবেলায় মনে পড়ে ওই প্রান্তরের মধ্য দিয়ে কাকু তার হাত ধরে নিয়ে যেতো। কিছুদূর গিয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে বলতো—দৌড়ো দিকিনি! ছোট্! নইলে মোটা ধুমসী হয়ে যাবি যে! বাবার সঙ্গে যেমন কোন কথাই বলা যায় না, তেমনি সব প্রাণের কথাই হতো কাকুর সঙ্গে। যত আবদার, যত অত্যাচার, যত বায়না সব সহ্য করতো কাকু। একবার মনে আছে—দূরের ওই পাহাড়টায় নিয়ে গিয়ে ছুটে উঠতে বলায় সে খানিকটা ছুটে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে কপাল কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে থাকে।

—কী করলি রে! পড়ে গেলি! আয়—আয় দেখি। এই বলে সমস্তটা পথ তাকে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে আসে কাকু।

বাবা বাইরে যাবার জন্য সামনের বারন্দায় দাঁড়িয়ে বাড়ির গাড়ী আসার প্রতীক্ষা করছিলেন, এদিকে চেয়ে বললেন—কাটলো কী করে?

—ও কিছু না। ছুটতে গিয়ে পড়ে গেছে। কাকু জবাব দিলেন।

—টিঞ্চার আইডিন লাগিয়ে দাও গিয়ে।

—হ্যাঁ। বলে কাকু তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

অঙ্কুর বাইরে বাইরে থাকে। ইউরোপের সমস্ত দেশ ঘুরেছে। আফ্রিকা ঘুরেছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা। বাড়িতে আসার সময় পায় না। আগে আগে তবু পূজোর সময় বাড়ি আসতো। পাঁচ বছর থেকে তাও আসে না। চন্দননগর কনভেণ্টে যখন সে পড়তো, তখন একবার কাকু গিয়েছিল সেখানে। কত যে জিনিস-পত্র নিয়ে গিয়েছিল তার আর শেষ নেই।

পড়ন্ত বিকেলের আলোর দিকে চেয়ে মন যেন কেমন ভারী হয়ে ওঠে। আশেপাশে এই বাড়ীঘর, আত্মীয়-স্বজন, মাসী, মনিয়া সবই যেন কেমন মিথ্যে মনে হয়। মনে হয় কেউ যেন কারো নয়। সবাই যেন একটা বিদেশে পড়ে আছে। আজ বিকেলে কেন কাকুর কথা মনে হলো তার!

মনিয়া বিকেলের জলখাবার—লুচি তরকারি আর দুধ নিয়ে এসে দাঁড়ালো। ডাকলো—দিদি!

চটকা ভেঙে চাইলো মনিয়ার দিকে উনা।

—খাবার এনেছি। খেয়ে নাও। এই বলে ঘরের কোণ থেকে একটা ছোট টিপয় টেনে এনে তার ওপর রাখলো। খেতে খেতে উনা বলল—মনিয়া, কাকুর কোন চিঠিপত্র আসেনি?

—না দিদি।

—কোন খবরও না?

—না দিদি।

—কী ব্যাপার বল তো! আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল—। মাঝে মাঝে এমন করে মনের মধ্যে!

খাওয়া শেষ হলো। ডিস গেলাস ইত্যাদি নিয়ে মনিয়া চলে গেল। উঠে পড়লো উনা। শাড়িটা পালটে বেড়াতে যাবার জন্য নীচে নামতেই দেখা হলো ললিতার সঙ্গে। উনার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—একাই বেড়াতে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ।

—তুমি এখন আর সেই দশবছরেরটি নেই। কোন দিকে যাবে? গ্রামে?

কোনদিনই ভাল লাগে না উনার এই ললিতামাসীকে। বড় বেশী গম্ভীর, বড় বেশী খবরদারী করা। কেন রে বাপু? কোলকাতার মতো জায়গায় সে একা থেকে পড়ে। এ কথাটা ভুলে যায় কেন এরা?

—না। বালুয়ার দিকে।

উত্তর দিকের বিশাল প্রান্তরকে গ্রামের লোক বালুয়া বলে। বোধহয় বালির প্রান্তর বলে।

—সাবধানে যেও আর বেশী দূর যেও না। অন্ধকার হবার আগেই ফিরে এসো। বুঝলে? কিছুদিন আগে নাগ্‌রা পাহাড়ের নীচে একটা মানুষ খুন হয়েছে।

—আচ্ছা—বলে উনা বেরিয়ে গেল।

প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথ। দু'পাশটা উঁচু-নীচু কিছুদূর অবধি। তারপরেই সমান হয়ে গেছে। এইরকম একা একাই বড় হয়ে উঠেছে উনা। বন্ধুবান্ধব যা ছিল গ্রামের মধ্যে, তাদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বাপের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোনদিনই ঘনিষ্ঠ নয়। একেই রাশভারী মানুষ, তারপর জমিদারি দেখাশুনা করতে মাসে অন্ততঃ দুবার বাইরে চলে যান। এক সপ্তাহ পরে ফিরে এলে দেখা যায় চোখ মুখ লাল, অপরিসীম

ক্লান্তি সর্বাঙ্গে। নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকেন। তিন চার দিন বেরোন না। তখন তাঁর খাবার-দাবার সব দিয়ে আসে মনিয়া। মনিয়া ছাড়া তখন অন্য কারো হুকুম নেই সে ঘরে ঢোকবার।

মনে আছে—একবার বাড়ির মধ্যে চোর চোর খেলতে খেলতে সে ছুটে ঢুকে পড়েছিল বাপীর ঘরের মধ্যে। প্রায়ান্ধকার ঘর। বাপী চুপ করে শুয়েছিলেন বিছানার ওপর। পায়ের কাছে বসে পা টিপে দিচ্ছিল মনিয়া। মেয়ের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী চাই তোমার ?

—কিছু না। বলে ভয়ে পিছু হটে বেরিয়ে এসেছিল সে। সেদিন ছোট ছিল বলে কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু আজ আর তার কাছে মনিয়ার রহস্য অবিদিত নেই। মনিয়ার রংটা কালো। কিন্তু অকৃপণ যৌবন-দাক্ষিণ্য ওর দেহে। ছিপছিপে শরীর। কিন্তু মনে হয় যেন পাথর কুঁদে তৈরী। ষোড়শী মনিয়াকে লুঠ করে নিয়ে এসেছিলেন বাপী। ললিতামাসী একথা জানে কিনা সে জানে না। কিন্তু তার কাছে এ রহস্য আর গোপন নেই।

একি! নাগ্‌রা পাহাড়ের নীচে এসে পড়েছে সে। হঠাৎ তার চোখে পড়লো একপাশে একটা বুনো ঝোপের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা একটি স্কুটার। কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবলো উনা। কার স্কুটার ? আবার কি একটা মানুষ খুন হয়েছে নাকি এখানে ? ওটা কি তারই স্কুটার ?

একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে ভাবতে লাগলো উনা। হঠাৎ একটা গুনগুন গানের আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে ওপর দিকে চেয়ে দেখলো, নাগ্‌রা পাহাড়ের ওপর থেকে একটা লোক নেমে আসছে। যুবকটি তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু উনা তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। লোকটির হাতে ছুটো তিনটে পাথরের টুকরো। নীচে নেমে স্কুটার তুলতে গিয়ে তার চোখ পড়লো উনার দিকে।

প্রথমটায় চমকে উঠলো। তারপর একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে বল্‌লো—আপনি কোত্থেকে এলেন ?

উনা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললো—ওই গ্রাম থেকে।

—ওই গ্রামে আপনার বাড়ি ?

—হ্যাঁ।

—বসবো একটু ?

সামান্য সরে গিয়ে উনা বললো—বসুন না !

যুবকটি বসলো। বললো খুব সাহস আছে আপনার বলতে হবে !

—কেন ? সামান্য হেসে উনা বললো।

—বাঃ ! একা একা এতদূরে বেড়াতে এসেছেন। ভয়ংকর নির্জন এদিকটা। আমারি তো ভয় ভয় করছিল।

—তাই বুঝি ? তা আপনিই বা একা এদিকে এসেছিলেন কেন ?

—আমি তো রোজই বিকেলে বেরোই। মধুপুরে বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছি। যেখানে যাই স্কুটার আমার সঙ্গেই থাকে। কাজেই কোন অসুবিধে হয় না।

—কোথায় বাড়ি আপনার ?

—বর্ধমান-বীরভূমের বর্ডারে কালীপুর বলে একটা জায়গা আছে, সেইখানে।

তারপর দুজনে বসে গল্প আরম্ভ করলো। কখন যে সন্ধ্যা উত্তরে গেছে, কখন পূব আকাশে বিরাট চাঁদ উঠেছে, সে সব খেয়াল নেই ওদের। হঠাৎ চমক ভাঙলো উনার। সে হাত-ঘড়ি দেখে বললো—একি ! সাতটা বেজে গেছে যে ! ছি ছি ! বাড়ীতে বলবে কী !

—কী আবার বলবে ? বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো যুবক। বলবেন—একজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই—

—বারে বুদ্ধি! আপনি তো পুরোনো বন্ধু নন—নতুন।

—দরকার হয়েছিল বলে যুধিষ্ঠিরের মত সত্যবাদীও "ইতি গজ"টা ছোট্ট করে বলেছিলেন।

—আমি এখন যাব কী করে? সামনের জ্যোস্না-ধোওয়া প্রান্তরের দিকে চেয়ে উনা বললো।

—কেন, স্কুটারে!

—সেকি!

—হ্যাঁ, এতে চমকে যাবার কী আছে?

—না, তা নয়—আচ্ছা চলুন।

বাড়িতে ফিরে দেখলো উনা ললিতা দেবী চাকরদের নির্দেশ দিচ্ছেন উনার খোঁজে যেতে। উনাকে দেখে বললেন—সাহসটা দেখছি তোমার ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে।

—কেন?

—কেন কী? কটা বেজেছে?

—একজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই—

—ভাল।

যুবকের নাম চন্দ্রচূড় রায়। আজ প্রায় দিন দশেক ধরে ওরা প্রত্যেকদিনই দেখা করে। দুজনে দুজনের পারিবারিক ইতিহাস বলে। উনা তাকে নিমন্ত্রণ করাতে এর মধ্যে একদিন সে গিয়েছিল তাদের বাড়ি। ললিতা প্রসন্ন মনে চন্দ্রচূড়কে গ্রহণ করতে পারেননি। ললিতার স্বভাবই এই। প্রথম দর্শনে কোন কিছুকেই তিনি স্বাগত জানান না। আগে তাকে বোঝবার, জানবার চেষ্টা করেন, তার পর আস্তে আস্তে তাকে পছন্দ করেন। আর একবার পছন্দ হয়ে গেলে তাঁর মন থেকে তা কিছুতেই যায় না।

চন্দ্রচূড় চলে যাবার পর ললিতা উনাকে বলেছিলেন—আমার কিন্তু ছেলেটিকে খুব ভাল লাগলো না।

—কেন? উনা প্রশ্ন করলো।

—আমার মনে হলো বন্ধুত্ব তোমাদের নতুন। সেইটে ঢাকবার জন্যে মিথ্যে কথা বলেছ। যাই হোক ছেলেটি ঠিক করতে পারছে না তোমাকে নিয়ে ও কী করবে। মোট কথা মেলামেশাটা ভেবে চিন্তে করো। এ বংশের সন্তান বলতে তুমি একা। নিশ্চয় এমন কিছু করবে না—

—মাসীমা! অধীর জবাব দিল উনা।—আমি কি এখনো সেই দশ এগার বছরের খুকীটি আছি যে তুমি বলে না দিলে নিজেদের ভালমন্দও বুঝবো না। তুমি বা তোমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। কোন ভয় নেই।

—ভাল। তবু গুরুজনদের তরফ থেকে তোমাকে কিছু বলা উচিত, তাই বললাম।

সেইদিন রাত্রে—

মনিয়াকে ডাকল উনা। এই বাড়ীত একমাত্র মনিয়াকেই তার নিজের লোক, সখী, বান্ধবী বলে মনে হয়। তাই নিজের সব কথাই বলে তাকে। এদিনও ডেকে উনা জিগ্যেস করলো—হ্যাঁরে মনিয়া!

—কী দিদি?

—আজ বিকেলে যে দাদাবাবু এসেছিলেন, তাকে কেমন লাগলো তোর?

—খুব ভাল দিদি। খুব ভাল। এই বলে মনিয়া উনার পেছনে দাঁড়িয়ে তার গা হাত পা টিপে দিতে দিতে প্রশ্ন করলো, —দিদির কি ভাল লেগেছে ওই বাবুকে?

—হ্যাঁ। বললো উনা।

হঠাৎ খুব খুশী হয়ে উঠলো মনিয়া। বললো— তাহলে কিন্তু ভাল হবে দিদি!

—হুঁ।

কিন্তু এই ভাল লাগাটা ভালবাসায় রূপান্তরিত হবার পূর্বেই চন্দ্রচূড় একটি কাজ করে বসলো। সেদিন বিকালে কিছুক্ষণ আগে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। পরিবেশটাও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। উনা নাগ্‌রা পাহাড়ের নীচে পৌঁছাবার আগেই দেখলো পাথরের চাঁইটার ওপর চন্দ্রচূড় বসে আছে। উনা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললো—তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে।

—আছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে বলে ফ্যালো। দেরি কোরো না।

—বোসো।

বসলো উনা। দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা অনেকখানি এগিয়েছে। পরস্পরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে। নিজেরাই অবাক হয় অন্তরঙ্গতার এই দ্রুতগামিতায়।

—বলো! বললো উনা।

—তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

হাঁ করে চেয়ে রইলো উনা কিছুক্ষণ চন্দ্রচূড়ের দিকে। তারপর হাসলো। বললো—তুমি কি মনে কর না যে এরকম একটা প্রস্তাব খুব তাড়াতাড়ি করছো, আমাদের পরিচয়ের এখনো পনেরো দিনও হয়নি।

হাসলো না চন্দ্রচূড়, চুপ করে উনার দিকে চেয়ে বসে রইলো। তারপর শান্ত গলায় বললো—কী জানি! হয়তো খুব তাড়াতাড়ি বলা হয়ে গেল। কিন্তু তোমাকে সব কথা আমার বলা হয়নি, শুনলে তুমিও বলবে আমার বলা অনুচিত হয়নি। উনা, আমার মনে হয় আমি বেশীদিন বাঁচব না।

—কেন? একথা বলছো কেন?

—বলছি আমার অল্পায়ুর বংশ বলে। আমার ঠাকুরদা মারা যান ত্রিশ বছর বয়সে। এক পিসী আর বাবা আছেন এখনো।

কিন্তু জ্যাঠামশায় মারা যান পঁচিশ বছর বয়সে। আমরা চার ভাই বোন। দিদি আছেন। আমার বড় দুই, একজন মারা যায় পঁচিশে, আর একজন বাইশে।

—তুমিও যে মারা যাবে, একথা আগে থেকেই ঠিক করে নিচ্ছো কেন?

—আমরা যে উইক হার্টের বংশ। তাছাড়া কী জানি, আমার খুব ভয় করে।

—ভয় করে? কেন?

—সে তুমি কালীপুর না গেলে বুঝতে পারবে না। প্রকাণ্ড জমিদারি, বিরাট বাড়ি, সবই ঠিক। কিন্তু—

—কিন্তু কী? বলো!

—ইতিহাসে পাওয়া যায় কালীপুর বিরাট একটা তন্ত্রপীঠ ছিল। চার মাইল জুড়ে ছিল দশমহাবিদ্যায় মন্দির। শোনা যায় আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সেই সব মন্দির ভেঙে তন্ত্রসাধকদের তাড়িয়ে ওখানে আমাদের বাড়ি তৈরি করেন। সেই সব মন্দিরের ইট দিয়েই আমাদের প্রাসাদ তৈরি হয়।

—কেন? কারণ কী?

একটুকাল চুপ করে চন্দ্রচূড় বললো—শোনা যায় তাঁর একটি পরমাসুন্দরী কুমারী বোনকে কুমারীপূজার নাম করে নিয়ে গিয়ে মঠের আচার্য তার ওপর অত্যাচার করে, তারপর তাকে মেরে ফ্যালে।

—তারপর?

—তারপর আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ক্ষেপে গিয়ে বেরিয়ে যান, এবং বোধ করি কালাপাহাড়ের সাহায্য গ্রহণ করেন।

চুপ করে চন্দ্রচূড়। কী রকম একটা অদ্ভুত মনে হয় উনার। প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের পীঠস্থান ছিল কালীপুর, একথা সে ইতিহাসে পড়েছে। সেই কালীপুর গ্রামের জমিদার পরিবারের একজন মানুষ

এইভাবে এসে তাকে বিয়ে করতে চাইবে, এর মধ্যে কেমন যেন শিহরণ অনুভব করে সে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আস্তে আস্তে বলে—আমার একার মতে তো কিছু হবে না। বাপীকে জিগ্যেস করতে হবে।

—প্লিজ উনা!

—ঠিক আছে। আমি আজই বাবাকে বলবো।

দুজনে একসঙ্গে উঠলো। উনাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আর একবার চন্দ্রচূড় তাকে মনে করিয়ে দিল।

কিন্তু কথা হচ্ছে বাবাকে বলে কী করে সে? কেমন করে বলে যে মাত্র পনেরো দিনের পরিচয়ে চন্দ্রচূড় তাকে বিয়ে করতে চাইছে, এবং তাতে তারও সম্মতি আছে? বাবা কী বলবেন? ভাববেন কী নির্লজ্জ হয়ে গেছে মেয়েটা! নিজে নিজেই বিয়ের ঠিক করে ফেললো।

শুধু বাবা নয়, ললিতা মাসী। তিনি তাঁর বাঁকা হাসির মাত্রা আরো বাড়াবেন। বলবেন—ওইজন্যেই একলা একলা ঘুরতে বারণ করেছিলাম। রাত্রে উনা কাউকে কিছু বললো না, শুধু মনিয়াকে নিজের কাছে ডেকে কথাটা বললো। মনিয়া একটুকাল চুপ করে থেকে বললো—দিদি, আমি মানুষ চিনি। আমি বলছি এ বাবু তোমাকে খুব ভালবাসবে।

—ভালবাসবে কীরে!

—হ্যাঁ দিদি। খুব পেয়ার করবে। তুমি দেখে নিও। তুমি কারো কথা শুনো না। ওকেই সাদী করো।

—কিন্তু বাবা কী বলবেন বল তো!

—কিছুই বলবেন না। খুশী হয়ে মত দেবেন। দেখো।

কথায় কথায় রাত অনেক হয়ে গেল। আরো অনেক কথা বললো উনা আর মনিয়া। দীর্ঘদিন থেকে যে চিন্তা উনার মাথার মধ্যে পোকার মতো বাসা বেঁধেছে, আজ তার বার বার মনে হচ্ছে

লাগলো এমন সুযোগ আর আসবে না—যা জিজ্ঞাসা করবার আজই করা ভালো। মনিয়াকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। অদ্ভুত যৌবন মেয়েটার।

—মনিয়া! ডাকলো উনা।

—কী দিদি?

—আজ যদি তোকে একটা কথা জিগ্যেস করি, তুই ঠিক ঠিক জবাব দিবি?

—কী কথা দিদি? ভয় ফুটে উঠলো মনিয়ার মুখে চোখে।

—আমার মা মারা যাবার পর তুই কি আমার মা'?

কোন জবাব দিতে পারলো না মনিয়া। ভয়ে আতঙ্কে তার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো। চাপা গলায় বললো—বাবু যদি একথা শুনতে পান তাহলে আমাকে খুন করে ফেলবেন।

—কেউ কিচ্ছু শুনবে না। দু'হাত দিয়ে মনিয়ার গলাটা জড়িয়ে ধরলো উনা। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললো—কেউ জানবে না, তুই চুপিচুপি আমাকে বল! কথাটা সত্যি? তাই না?

মাথা নীচু করলো মনিয়া।

ভোরবেলায় শংকর যখন চা খেতে এসে বসেছেন, সেই সময় উনা এসে বসলো বাপের কাছে। শংকর একমূহূর্ত মেয়ের দিকে চেয়ে থেকে বললেন - তোমার শরীর কেমন আছে মা?

—ভালো আছে বাপী!

—শুকনো শুকনো লাগছে কেন?

—ও কিছু না।

আরো কিছুক্ষণ পরে বাপের মনের গতি বুঝে উনা কথাটা পাড়লো। বললো—কয়েক দিন আগে যে ছেলেটি আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করলো, তাকে কেমন লেগেছে বাপী?

—কোন্ ছেলেটি বল তো? ও! সেই তোমার সেই বন্ধু কী যেন তার নাম—

—চন্দ্রচূড়। বললো উনা।

—হ্যাঁ। হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপানে! শিবের স্তব। বেশ ভালই তো ছেলেটি! কেন মা?

বললো উনা। প্রায় দশ মিনিট কাল চুপ করে চা সামনে নিয়ে বসে রইলেন শংকর। যেন মেয়ের কথা ভুলে গেছেন তিনি, তারপর আস্তে আস্তে বললেন—কোথাকার ছেলে ও?

—ওরা হলো বীরভূম জেলায় কালীপুরের রায় ফ্যামিলী।

বিস্ময় ফুটে উঠলো শংকরের চোখে। তিনি কিছুক্ষণ থেমে বললেন—খুবই বনেদী জমিদার। ওরা হলো তারার উপাসক। শাক্ত। বেশ। আমার কোন আপত্তি নেই।

ললিতা দেবী এসে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনেছিলেন। তিনি গলাটাকে একটু শক্ত করে বললেন—বামুন না কায়েত সেটাও তো জানা দরকার। না, আজকাল তাও জানবার দরকার হয় না।

—নিশ্চয় দরকার হয়। শংকরের কণ্ঠও শক্ত শোনালো। —কালীপুরের রায়বংশ ব্রাহ্মণ।

—ও ঘরে করা চলে কিনা—ললিতা দেবী বললেন।

—না। উনার ব্যাপারে আমি সে সব দেখবো না। একটি মাত্র মেয়ে আমার। তার কোন স্বাধীন ইচ্ছেয় আমি বাধা দেব না। ও যদি মনে করে থাকে চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে বিয়ে হলেই ও সুখী হবে, তবে তাই হোক! এই বলে সশব্দে চেয়ারটাকে ঠেলে দিয়ে শংকর উঠে পড়লেন। তারপর আস্তে আস্তে শোবার ঘরের দিকে শক্তপায়ে চলে গেলেন।

—তবে আর কি! ধেই ধেই করে নাচো এবার। এই বলে মুখ ঝাপটা দিয়ে ললিতাও রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। দূরে ঘরের কোণে মনিয়া দাঁড়িয়েছিল চুপ করে, সে চোখ তুলে

উনার দিকে চাইলো। উনা দেখলো সে চোখের কোলে কোলে জল।

উভয়েই তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেখান থেকে চলে গেল মনিয়া। উনাও বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে।

উনা এসে বসল চন্দ্রচূড়ের কাছে। আগে থেকেই উনার জন্য অপেক্ষা করছিল চন্দ্রচূড়।

উনা বললো চন্দ্রচূড়কে—বাবা রাজী হয়ে গেছেন। তোমার বাড়িতে লেখো।

—আমার বাড়ি থেকে কেউ আসতে পারবে না। বললো চন্দ্রচূড়।

—তার মানে?

—তার মানে আসার মতো কেউ নেই।

অবাক হলো উনা। কিন্তু কিছু বললো না। চুপ করে কিছু-ক্ষণ চেয়ে রইলো চন্দ্রচূড়ের দিকে। বললো—তাহলে কী হবে?

—কিসের কী হবে?

—বিয়ের।

—হ্যাঁ। বিয়ে তোমাদের বাড়িতেই হবে। মধুপুর থেকে আমার এক বন্ধু আসবে। তোমাদেরই পুরুত। তোমাদেরই সব।

—বাঃ! সেটা কী ভাল দেখাবে?

—প্লিজ উনা! ভাল মন্দের বিচারগুলো এখন মুলতুবী রাখ। পরে ভেবেচিন্তে যা হয় করা যাবে। আপাততঃ আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক। তুমি জানো না দিনরাত আমার মনের মধ্যে একটা ভয়-ভয় লেগেই আছে। তুমি আমার জীবনে এলে, আমার কাছে থাকলে এই ভয়-ভয়টা কেটে যাবে বলে মনে হয়। আমার বাড়ি থেকে কেউ নাই বা এলো, কী আসে যায় তাতে?

এর পরে আর কী বলবে উনা? সে চুপ করে গেল। মনে মনে বললো—তাই হোক, তোমার যা ইচ্ছে তাই হোক।

শংকর মিশ্র একটু বিরক্ত হলেন মনে মনে কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেওয়ালেন। মধুপুর থেকে দুজন বন্ধু এসেছিল চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে। তারা খেয়েদেয়ে অনেক রাত্রে চলে গেল। রূপসী উনাকে দেখে তারা খুব খুশী হলো।

আগের ব্যবস্থা মতো পরদিন চন্দ্রচূড় আর উনা মধুযামিনী যাপন করতে বেরিয়ে গেল। শংকর কোন আপত্তি করলেন না। ললিতা দেবী আপত্তি করাতে তিনি বললেন—বিয়ে হয়েছে ওদের। সংসার করবে ওরা। আমরা মাঝখান থেকে আইনকানুন ওদের ঘাড়ে চাপাই কেন? ওরা যা ভাল মনে করে করুক।

যথাসময়ে বর কনে রওনা হয়ে গেল। শংকর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিদায় দিলেন। শুধু বেরোবার সময় মনিয়াকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

আগেই কথা হয়েছিল কোলকাতায় এসে ওরা গ্র্যাণ্ডে থাকবে। সাত দিন থাকার মধ্যে উনা তার বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করবে এবং একদিন তাদের নিমন্ত্রণ করে পার্টি দেবে।

যথাসময়ে কোলকাতায় পৌঁছে গেল ওরা। আগেই গ্র্যাণ্ডে 'তার' করা ছিল। গ্র্যাণ্ড হোটেলের পরিচ্ছন্নতা ও আরামের মধ্যে দুজনে দুজনকে খুঁজে পেল। এবং দুটি তরুণ তরুণী বিশ্ব-সংসার ভুলে গেল। তিন দিন পর্যন্ত তাদের ঘরের বাইরে বেরোতে দেখা গেল না।

চার দিনের দিন চন্দ্রচূড়কে নিয়ে বেরোলো উনা ট্যাক্সি করে। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা করে তাদের নিমন্ত্রণ করলো পরের দিনের পার্টিতে। সকলেই অবাক। অরুণা উনার সব চেয়ে প্রাণের বন্ধু। সে বললো—বিয়ের জন্যে তুই ভেতরে ভেতরে এত কাহিল হয়ে পড়েছিলি এ তো ভাবিনি। করলি কী রে?

—হয়ে গেল তাই। লজ্জিত মুখে জবাব দিল উনা।

যথারীতি পরদিনের পার্টিতে সবাই এলো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আনন্দ করে বাড়ি ফিরে যাবার সময় সবাই বললে—চমৎকার স্বামী পেয়েছিস উনা। যেমন ভদ্র তেমন মার্জিত।

স্বামী সৌভাগ্যে কে না সুখী হয়—উনাও হলো।

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে উনা বললো—আমরা তো পরশু দিন কালীপুর যাচ্ছি?

—হ্যাঁ।

তোমার বাড়ীর কথা কিছু বল!

—বলেছি তো!

—আচ্ছা, যেখানে দশমহাবিদ্যার মন্দির ছিল সেখানে এখন কী আছে?

—তার বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে তো আমাদের বাড়ি তৈরী হয়েছে। বাকী মাইল দুই পর্যন্ত ভাঙা স্তূপ। কোন কোন জায়-গায় মন্দিরটাই গোটা আছে—ভেতরে কোন মূর্তি নেই।

—যাও সেদিকে?

—হ্যাঁ। কোন কোন দিন বেড়াতে যাই ওদিকে। ধ্বংস-স্তূপের ভেতর দিয়ে পথ আছে। তাছাড়া কাছাকাছি গ্রাম আছে—সে সব গ্রামে যেতে হলে ওর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। শর্ট-কার্ট হয়। যাই হোক তুমি যদি যেতে চাও, নিয়ে যাব সঙ্গে করে একদিন।

—কোনরকম ভয়টয় পাওনি?

চমকে উঠলো চন্দ্রচূড়। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললো—ভয় পাবার কথা কেন বলছো? ভয় পাব কেন?

সহজভাবেই জবাব দিল উনা।—না, আমি বলছিলাম—দশমহা-বিদ্যার মন্দির তো ছিল ওখানে?

—হ্যাঁ তা ছিল।

—সেখানে তো কত রকম ক্রিয়াকলাপ, কত বিচিত্র মন্ত্রোচ্চারণ হয়েছে। ওখানকার লোকেরা চোখে সে সব না দেখলেও মুখে তো শুনেছে। স্মৃতিতে আছে। তাই বলছিলাম—

গম্ভীর হয়ে গেল চন্দ্রচূড়। অনেকক্ষণ অবধি কোন কথা বললো না। বেশ কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বললো—খুব আশ্চর্য প্রশ্ন করেছ তুমি। তাহলে তোমাকে আরো কিছু বলি শোন। শোনা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষ যখন কালাপাহাড়ের সাহায্য নিয়ে সব কিছু ধ্বংস করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তখন দশমহাবিদ্যাপীঠের যিনি আচার্য ছিলেন, তিনি নাকি অভিশাপ দেন—

—কি অভিশাপ দেন ?

অভিশাপ দেন, মন্দির ভেঙে সমভূমি করে দেবীমূর্তিগুলি নদীতে বিসর্জন দিলেও, এই মহাবিদ্যার পীঠ চিরকাল তোর বংশকে ভয় দেখাবে। মহাদেবীর অভিশাপে সর্বনাশ হবে তোর !

—ও ! বলে উনা চুপ করে গেল। সে এ যুগের মেয়ে। এসব কথা বা ঘটনা বিশ্বাস করা তার উচিত নয়। তবু যেন মনের মধ্যে কোথায় রিমঝিমএর সত্যতার সুরটা বাজতে থাকে। তখন যেন আর একে অবিশ্বাস করতে পারা যায় না। মনে হয় সব ঠিক। সব আছে, কিছুই হারায়নি। কিন্তু সে জায়গা তো এখনো চোখেই দেখেনি উনা।

আশ্চর্য ! যেদিন ওরা কালীপুর রওনা হবে, ঠিক তার আগের দিন রাত্রে উনা একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখলো। দেখলো—সে যেন একা একটা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছে। চারপাশে বড় বড় ধ্বংসস্তূপ। কোনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, কোনটা বড় বড় থাম নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একা চলেছে উনা। কিন্তু তার মধ্যেও সে যেন আর একটা অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করছে। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে দ্রুতপায়ে পার হয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের রাজত্ব। হঠাৎ যেন সে মুখ তুলে দেখলো তার

যাওয়ার পথ আটকে এক জটাজুটধারী কাপালিকের মতো সন্ন্যাসী। লাল কাপড় চাদর পরা, কপালে সিঁদুর আর রক্তচন্দনের ফোঁটা। বড় বড় চোখ দুটো লাল। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি উনার মুখে নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে তিনি উচ্চারণ করলেন—কোথায় চলেছ?

—চন্দ্রচূড় রায়ের বাড়ি।

—কেন? সেখানে কী?

—আমি তার স্ত্রী।

—এ দুর্বুদ্ধি কে দিলে? ও মরবে—তুমি মরবে। মায়ের অভিশাপ আছে ওই বংশের ওপর। কেউ বাঁচবে না। কেউ রক্ষে পাবে না। সাবধান! এখনো সময় আছে—ফিরে যাও।

উনার মনে কোত্থেকে যেন একটা দুর্জয় বল ফিরে এলো। সে সোজা কাপালিকের চোখের দিকে চেয়ে বললো—এই শতাব্দী আপনাদের এই সব বুজরুকিতে বিশ্বাস করে না।

—বিশ্বাস করে না?

—না।

—তবে বিশ্বাস করাচ্ছি। এই বলে তিনি তাঁর হাতের ত্রিশূলটি ছুঁড়ে মারলেন উনার দিকে। প্রচণ্ডবেগে বুকে এসে লাগলো ত্রিশূল। যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো উনা।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলো তার মুখের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে চন্দ্রচূড় ডাকছে—উনা! উনা! কী হয়েছে তোমার? এমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন? কী হয়েছে!

—এ্যাঁ! না কিছু না। এই বলে কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে উনা বললো—একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম।

—স্বপ্ন? কী স্বপ্ন? তুমি ভয়ানক ছটফট করছিলে, আর ঘুমের মধ্যে একটা অদ্ভুত শব্দ করছিলে। কী স্বপ্ন দেখেছো?

—একজন সন্ন্যাসীর।

—সন্ন্যাসী! ভয়ে যেন মুখ শুকিয়ে গেল চন্দ্রচূড়ের। ঢোঁক গিলে বললো—কী রকম সন্ন্যাসী?

—লাল কাপড় পরা। ফরসা টকটকে গায়ের রং। কপালে রক্তচন্দন আর সিঁদুরের টিপ। অদ্ভুত দেখতে।

—কী—কী বললেন—মানে কিছু বলেছেন তিনি তোমাকে?

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে উনার মনে হলো স্বপ্নের কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। বললো—না কিছু বলেননি। শুধু তাঁর ত্রিশূলটা যেন ছুঁড়ে মারলেন আমার দিকে।

যন্ত্রণায় যেন গোঁ গোঁ করে উঠলো চন্দ্রচূড়। কী যেন স্ত্রীকে বলতে গিয়ে বললো না। চুপ করে বসে রইলো সে। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললো—চল আমরা কালই এখান থেকে চলে যাই।

—তাই চলো।

॥ দুই ॥

দুবার ট্রেন বদল করে রাত আটটা নাগাদ ছোট্ট দশপীঠ স্টেশনে গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই চন্দ্রচূড় ক্ষিপ্রহাতে সব মালপত্র নামিয়ে ফেলল, তারপর প্রায় কোলে করে উনাকে নামিয়ে নিল প্ল্যাটফর্মে।

চারিদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। দূরে দূরে হ্যারিকেনের বাতি। চারপাশে জোনাকি জ্বলছে। পাশের জঙ্গলে শেয়ালের ঐক্যতান হয়ে থেমে গেল।

—কেউ আসেনি আমাদের নিতে? ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলো উনা।

—কই, দেখছি না কাউকে! কী হলো—আমার চিঠি কি পায়নি? তাছাড়া টেলিগ্রামও করেছি। চলো। স্টেশনের মধ্যে গিয়ে বসি।

হাজার ডাকাডাকি করেও কুলি পাওয়া গেল না। নিজেই এক এক করে জিনিসগুলো বয়ে নিয়ে এলো চন্দ্রচূড়। তারপর স্টেশনের মধ্যে একটা বেঞ্চিতে চুপ করে গিয়ে বসলো। বললো —এসো এখানে বসে অপেক্ষা করা যাক।

—তোমার চিঠি যদি না পেয়ে থাকেন ওঁরা?

—তাহলে বেশ ভালই হবে। সারারাত এখানে বসে অপেক্ষা করতে হবে। ভোরে বেরিয়ে কাছেই একটা গ্রাম আছে, সেখান থেকে একটা গরুর গাড়ি যোগাড় করতে হবে।

—কতদূর কালীপুর এখান থেকে?

—তা প্রায় পাঁচ ছ' মাইল তো বটেই।

দুজনে চুপচাপ বসে রইলো। এটা ব্রাঞ্চ লাইন। সারারাত্তিরে আর গাড়ি নেই। স্টেশন মাস্টার চিনতেন চন্দ্রচূড়কে। তিনি হ্যারিকেন হাতে বেরিয়ে এসে বললেন—ছোটবাবু! চিঠি যদি কত্তা না পেয়ে থাকেন,—

—হ্যাঁ। মুশকিল হবে।

—তাহলে আমার কোয়ার্টারে দয়া করে বিশ্রাম করবেন চলুন। রাত্রের মত দুটো ডাল ভাত—

—না না। ধন্যবাদ। উনা বললো।—তার দরকার হবে না। আমাদের সঙ্গে রুটি মাখন কলা মিষ্টি সবই আছে—দরকার হলে খেয়ে নেব।

—ইনি?—স্টেশন মাস্টারের সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

—আমার স্ত্রী। বললো চন্দ্রচূড়।

—স্ত্রী? মাস্টারমশায় একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন—কই শুনিনি তো!

দূরে ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রচূড় বললো —ওই তো গাড়ি আসছে আমাদের।

দেখতে দেখতে আওয়াজ কাছে এলো। একখানা ব্রুহাম গাড়ি এসে থামলো স্টেশনের সামনে। বৃদ্ধ কোচোয়ান ইদ্রিশ. টর্চ হাতে এগিয়ে এসে সেলাম করে সামনে দাঁড়ালো। কিন্তু উনা পরিস্কার দেখলো সে যেন উনাকে দেখে একটু চমকে উঠলো।

—এত দেরি করলি কেন রে?

ইদ্রিশ বললো—এই কিছুক্ষণ দিদি আমাকে ডেকে বললেন—গাড়িটা নিয়ে স্টেশনে যা ইদ্রিশ। চাঁদ রাজা আসছে।

স্টেশন মাস্টার দাঁড়িয়ে রইলেন। ইদ্রিশ এক এক করে সব বাক্স বিছানা গাড়িতে তুললো। তারপর গাড়ি ছাড়লো।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল উনা। চন্দ্রচূড়ের ডাকে চোখ মেললো। চন্দ্রচূড় বললো—উনা, চাঁদ উঠেছে। গাড়ির দরজা খুলে দিচ্ছি, তোমার ডানদিকে দশমহাপীঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবে।

উনা চেয়ে দেখলো—ঝাপসা চাঁদের আলোয় ডান পাশে যত-দূর দেখা যায় কেবল স্তূপ স্তূপ আর স্তূপ। নিঃশব্দে আপন ভাঙা অস্তিত্ব নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কানে এলো চন্দ্রচূড় বলছে—এরই কিছু অংশ সমভূমি করে ওই সব ইট দিয়ে আমা-দের প্যালেস তৈরী হয়েছে এইটেই প্রবাদ। আর ঘুমিয়ে পোড়ো না। আমরা এসে গেছি।

উনার যেটুকু ঘুমোবার সেটুকু ঘুম হয়ে গেছে। আর দরকারও ছিল না। তার মন এখন এই অজানাকে জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। উৎসুক হয়ে উঠেছে। চাঁদের আলোতে দূরে প্রকাণ্ড একটা বাড়ির গম্বুজ দেখা গেল।

—ওই যে তোমার বাড়ি। চন্দ্রচূড় বললো।

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে চেয়ে রইলো দূরের ওই দুর্গের মতো বাড়িটার দিকে উনা।

বিরাট কম্পাউণ্ড।

গাড়ি ঢুকলো তার মধ্যে। মাঝখানে বাগান। চারপাশ দিয়ে পথ। লম্বা থামওয়ালা বারান্দার ধারে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ -ছেচল্লিশ। বিধবা। যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন যৌবনে। এখনো সে যৌবন যাই যাই করেও পুরো চলে যায়নি। পাশে পাশে একজন চাকর একটা হ্যাসাক্ ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো। চন্দ্রচূড় পরিচয় করে দিল।—আমার অনুদি। অনুসূয়া।

—এসো ভাই। অনুসূয়া মৃদু হেসে বললো।—গাড়ি পাঠাতে দেরি হওয়ার জন্যে আমাদের কোন দোষ নেই। আজ সন্ধ্যের পরে টেলিগ্রামটা পেয়েছি। উইথ ওয়াইফ লেখা ছিল বলে বুঝতে পারলাম চাঁদ বিয়ে করে বাড়ি ফিরছে।

উনা স্বামীর দিকে চাইলো। খবরটা যেমন অদ্ভুত তেমনি আশ্চর্যজনক। খবরই দেয়নি বাড়িতে! কিন্তু কেন? তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়ে গেল উনা। সে লক্ষ্য করলো অনুসূয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে লক্ষ্য করছে। সে হেসে বললো—বোধহয় আপনাদের অবাক করে দেবার জন্যেই এই কাণ্ড করেছে।

—তাই হবে বোধহয়। এই বলে উনার হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো অনসূয়া।

বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই লম্বা-চওড়া বারান্দা। তার ওপরেই বিরাট হলঘর। উনা ঘরে ঢুকে দেখলো ঘরের এককোণে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। লম্বা মানুষ। টকটক করছে গায়ের রং। তীক্ষ্ণ নাক। মাথার চুলগুলো সব শাদা। মোটা একটা বার্মা চুরুট টানছিলেন তিনি। অনুসূয়া উনাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললো—জেঠু, চাঁদের বৌ। উনার দিকে ফিরে বললো—তোমার শ্বশুর।

মাটিতে বসে পড়ে বৃদ্ধের পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম

করলো উনা। তিনি উনাকে ধরে তুলে নিয়ে কৌচের পাশে বসালেন। বললেন—বোসো বোসো, তুমি আমার কাছে বোসো। আমি তোমাকে একটু দেখি। এই বলে তিনি উনার চিবুক ধরে মুখটা তুলে ভাল করে দেখে বললেন—বা বা! এ তো খাসা মেয়ে এনেছে চাঁদ বৌ করে! অনু! তোর কী মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ। ভালই তো। বললো অনুসূয়া।

আসামাত্র উনা একটা ব্যাপার অনুভব করলো। তা হচ্ছে—এ বাড়িতে অনুসূয়াই কর্ত্রী। তার হুকুমেই এখানে সব চলে। রাশভারী মেয়ে। চোখ দুটো বড়। কিন্তু দৃষ্টির মধ্যে সব সময় যেন একটা হিসেব উঁকি মারছে।

ছেলেকে প্রণাম করতে দেখে বৃদ্ধ বললেন—ইডিয়ট্ কোথাকার! একটু জানাবি তো আগে! যাই হোক খুব ভাল, ভারী চমৎকার হয়েছে আমার মা। অনু, চাঁদের ঘরটা সাজানো-গোছানো আছে তো?

—হ্যাঁ। সে সব ঠিক আছে। এসো ভাই, তোমাকে তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই। চাঁদ, আসবি নাকি?

—না। তুমি যাও। আমি বাবার কাছে একটু বসি। মোহনকে দেখছি না?

—সে তো ছিল বাড়িতে। এখন কোথাও বেরিয়েছে হয়তো।

তিনতলায় চন্দ্রচূড়ের শোবার ঘর। অনুসূয়া ঘরে নিয়ে এলো। প্রকাণ্ড ঘর। বড় বড় জানালা। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একটা দরজা, যেটা দিয়ে বেরোলে একটা ছোট্ট মতো গোল বারান্দায় পৌঁছানো যায়। গিয়ে দাঁড়ালো উনা। প্রথমেই চোখে পড়লো চাঁদের ম্লান আলোতে সেই দিগন্তজোড়া ধ্বংসস্তূপ। উনা সেই দিকে চেয়ে আছে দেখে অনুসূয়া এগিয়ে এসে বললো—ওটাকে এখানকার লোকেরা "দশবিদ্যার থান" বলে। আসলে ওটা ছিল দশমহাবিদ্যার মন্দির। শোনা যায় এক একটি মহাবিদ্যার মন্দিরকে ঘিরে আনু-

সংশ্লিক আরো মন্দির। আধ মাইল জুড়ে এক এক দেবীর মন্দির। রাতবিরেতে লোকে এখনো ভয় পায়। অনেকে দেখেওছে—লাল কাপড় পরা জটাওয়ালা এক তান্ত্রিককে প্রায়ই দেখা যায় ওই ভাঙাচোরা মন্দিরের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরতে। যাকগে। ওসব ব্যাপারে তুমি মন দিয়ো না। ভেতরে এসো।

উনাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিল অনুসূয়া। বললো—খাবার দিলে আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। তুমি বিশ্রাম করো। এই বলে দরজা অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলো অনুসূয়া।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমাদের এটা অনেকদিনের পুরোনো বাড়ি তো! কাজেই অনেক সময় অনেক কিছু দেখা যায়। রাত্রে বেরোবার দরকার হলে—তোমার ঝি ওই পাশের বারান্দাতেই থাকবে, তাকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ো। কেমন? তুমি নতুন বলেই বলছি। থাকতে থাকতে পুরোনো হয়ে গেলে আর ওসব গায়ে লাগবে না। এই অবধি বলে স্থির চোখে উনাকে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বললো—অনেক সময় আমাদের এই বাড়িতে এমন সব ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে, যার কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বছরখানেক আগে চাঁদের বড়ভাই—ওই যে বারান্দাটায় তুমি দাঁড়িয়েছিলে ওইখান থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

—কেন? উনা আচমকা প্রশ্ন করে।

—কেন তা কী করে বলবো। দুই ভাই ঘরে শুতো। সেদিনও শুয়েছিল। পূর্ণিমার রাত। সেইদিনই সকালে আমি শ্বশুরবাড়ী থেকে শাঁখা সিঁদুর ভেঙে আমার ছেলে মোহনের হাত ধরে চিরকালের জন্য বাপের বাড়ি চলে এলাম। রাত্তিরবেলায় আমাদের কম্পাউণ্ডে দুটো অ্যালসেসিয়ান কুকুর ছাড়া থাকে, তাদের চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। নীচে গিয়ে দেখলাম সূর্যদা নীচে পড়ে আছে। মাথাটা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু এখন থাক এসব কথা।

তুমি বিশ্রাম করো। তোমাদের দুজনের খাবার কি এ ঘরেই পাঠিয়ে দেব ?

—হ্যাঁ, বললো উনা।

অনুসূয়া চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হতেই উনার মনে হলো তার সারা গায়ের মধ্যে কী রকম যেন গুলিয়ে উঠছে। বমি হবে বোধহয়। সে প্রকাণ্ড খাটটার ওপর চুপচাপ শুয়ে পড়লো।

ধীরে ধীরে তার মাথার মধ্যে আর একটি চিন্তার ধারা বইতে থাকে। সে বাড়ির নতুন বৌ। এখনো একঘণ্টা হয়নি তার আসার। এরই মধ্যে তাকে এসব পারিবারিক ইতিহাস বলার কী অর্থ। এসব কথা তো দু'দশ দিন পরে বললেও চলতো। আজই কেন ? এখুনি কেন।

খুঁজতে থাকে উনা। কারণ খুঁজতে থাকে। মোহন যার নাম সে অনুসূয়ার ছেলে। কত বয়স তার ? ছেলে নিয়ে এখানে পড়ে আছে কেন অনুসূয়া ? তার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ? সেখানে কি কেউ নেই ? আর আছেন তার বৃদ্ধ শ্বশুর। চাঁদের বাবা। আর কে ? এত বড় বিশাল বাড়িতে আর কেউ থাকে না ?

ভাবতে ভাবতে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছে উনা। ঘুম ভাঙলো চন্দ্রচূড়ের ডাকে।

—তুমি ভয়ানক টায়ার্ড হয়ে পড়েছ উনা! ওঠো! আমাদের খাবার দিয়ে গেছে। খাবে না ?

—হ্যাঁ।

খেতে বসে উনার মনে হলো জিগ্যেস করে স্বামীকে পারি-বারিক কিছু কথা। কিন্তু আজ যেন তার দেহে মনে কোথাও বল নেই। কোনরকমে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লো।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে সে অনুভব করেছে স্বামী তাকে আদর করছে। তার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এতই ক্লান্তি

নেমেছিল তার দেহে মনে সেদিন যে কোনক্রমেই সে চোখ খুলে চাইতে পারলো না।

ঘুম ভাঙলো ভোরে।

সদ্যোদিত সূর্যের আলো তার মুখে পড়ায় ধড়মড় করে উঠে বসলো উনা। পাশে স্বামী নেই। সে আরো ভোরে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াতেই ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এলো। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলো দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে আসছে চন্দ্রচূড়। কী অপূর্বই না দেখাচ্ছে ওকে! সে চুপ করে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো তার স্বামীকে। একটু পরেই খয়েরী রংয়ের তেজীয়ান ঘোড়াটা কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়লো।

দরজার পর্দা সরিয়ে একটি তারই বয়সী মেয়ে ঘরে ঢুকলো। উনার কাছে এসে সবিনয়ে বললো—রানীমা, দিদিরানী আজ সকাল থেকে আমাকে আপনার সেবা করতে বলেছেন। চা জল-খাবার কি আনবো? চাঁদ রাজাও এসে পড়েছেন।

তার দিকে চেয়ে উনা বললো—তোমার নাম কী?

—আমার নাম শীলা।

—এই গ্রামেই বাড়ি?

—না রানীমা। আমাদের বাড়ি এখান থেকে সাত আট ক্রোশ দূরে। আমি এখানে কাজ করি, আর আমার ছোটবোন লীলা তারাপুরে পিসীরানীমার বাড়িতে কাজ করে।

—পিসীরানীমা কে?

—কর্তা রাজার বড়বোন। এখান থেকে তারাপুর আধ মাইলের মধ্যে। লীলা সেখানে কাজ করতে করতে ওঁদের কচুয়ান উমা-পদকে বিয়ে করে। সামনের মাসে বাচ্চা হবে। সেই সময়

কয়েকটা দিন আমাকে ছুটি দিতে হবে রানীমা। ভারী ভীতু আমার বোনটা। ওর কাছে না থাকলে ভয়েই মরে যাবে।

—আচ্ছা আচ্ছা সে হবে। যাও তুমি খাবার নিয়ে এসো। আর চাঁদ রাজা যদি নীচের হলঘরে এসে থাকেন, তাহলে তাঁকে বোলো আমি ডাকছি।

—আচ্ছা রানীমা।

শীলা চলে গেল। মেয়েটা বড্ড কথা বলে। কিন্তু দেখতেও মোটামুটি ভাল। ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। একটু পরেই চন্দ্রচূড় এসে ঘরে ঢুকলো, তার পেছনে পেছনে এলো চন্দ্রের চাইতে বছরখানেক কি বছর দুয়েকের ছোট—মোহন। অনুসূয়ার ছেলে। দেখতে ভালই—লম্বা চেহারা। ঢুকেই উনার দিকে চেয়ে একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর হেসে বললো—গুডমর্নিং চাঁদমামী। কাল রাত্রে এমন একটা যায়গায় গিয়ে আটকে গেলাম যে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারলাম না। ফিরলাম যখন তখন তোমার আর চাঁদমামার আদ্ধেক রাত্তির। ভাবলাম—যাকগে মরুকগে। ভোরে তো দেখা হবেই, তাহলে আর শুধু শুধু রাত্তির বেলায় ডিস্‌টার্ব করি কেন? তা বল চাঁদমামী, জায়গাটা কেমন লাগছে?

—ভালই তো। মুখে হাসির রেখা টেনে বললো উনা।

—তবু ভাল। ভোরবেলায় উঠে চারদিকে কেবলই তো ধ্বংসের চেহারা দেখি। এবার থেকে তোমার মুখটা দেখলে তবু কিছুটা নতুনকে দেখা যাবে। কিছু সৃষ্টির ইঙ্গিত। টেনে টেনে বললো মোহন।

—ও! তুমি কবিতা লেখো বুঝি? উনা প্রশ্ন করলো।

—রামঃ! প্রেরণা কোথায় এখানে? সবে তো কাল রাত্তিরে এসেছ, আজ সকাল থেকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখ চারদিকে। দেখবে কতকগুলো অতীতের কঙ্কাল বুকে নিয়ে এখানে বসে আছি আমরা।

—আমরা মানে ? উনা বললো।

—আমরা মানে—আবার সেই টেনে টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে বলা মোহনের।—আমরা মানে কালীপুরের আমরা, তারাপুরের তাঁরা, আর কমলাপট্টির ওঁরা।

এবার বাধা দিল চন্দ্রচূড়।—তুই যে তাঁরা ওঁরা বলে বলছিস —কী বুঝবে ও ? খুলে বল।

—খুলে তুমি বলো চাঁদমামা। আমার অত ধৈর্য নেই, তাছাড়া সময়ও নেই। এই বলে মোহন পেছন ফিরেছে যাবার জন্য, ঘরে ঢুকলো শীলা ট্রে ভর্তি খাবার-দাবার নিয়ে। তার পেছনে বলরাম ওরফে বলা নামে বাচ্চা চাকর দু' গেলাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

—মোহন, শেয়ার কর ! আয়।

মোহন মামার দিকে ফিরে চেয়ে হেসে বললো—তুমি কে নেমন্তন্ন করবার চাঁদমামা ? হোস্টেস তো কিছুই বলছেন না।

—এসো সবাই মিলে খাওয়া যাক। উনা হেসে বললো ?

খেতে বসে উনা শুনলো বৃদ্ধ অম্বিকাপ্রসাদ রায়েরা আট ভাই বোন। তার মধ্যে বেঁচে আছেন তিনজন। একজন উনার শ্বশুর অম্বিকা। তাঁর ছোটভাই ত্র্যম্বক, আর তারাপুরে বিয়ে হয়েছিল যাঁর, তিনি অম্বিকারও দিদি। নাম ভুবনেশ্বরী। বয়স তাঁর প্রায় পঁচাশি। কিন্তু এখনো তিনি সোজা হয়ে চলেন। অত্যন্ত রাশ-ভারী স্ত্রীলোক। এখনো তারাপুরের জমিদারি তিনি একাই চালান। তাঁর পাঁচটি সন্তানের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে বেঁচে ছিল। তার বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রেখেছিলেন জামাইকে। তাঁদের একটিমাত্র ছেলে—নাম সুরঞ্জন। চাঁদের চাইতে একবছরের ছোট। সেই জমিদারির মালিক। কিন্তু আসল মালিক ভুবনেশ্বরী এখনো। আর ওঁরা বলে মোহন যাঁর কথা বললো, তিনি হচ্ছেন অম্বিকাপ্রসাদের গৃহচিকিৎসক—কবিরাজ। অম্বিকা এ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি কিছুই বিশ্বাস করেন না—একমাত্র কবিরাজী ছাড়া।

চন্দ্রচূড় বললো—বাবার আবার বাত আছে তো। অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাড়ে। সেই সময় মালিশ ইত্যাদি জড়িবুটি শেকড়বাকড়ের রস দিয়ে বাবাকে খাওয়ানো হয়। ওই যে বলা বলে চাকরটা আছে বাবার দেখাশোনা ওই করে।

মোহন এদের সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে যাবার সময় উনাকে বলে গেল—আমার গর্ভধারিণী, অর্থাৎ অনুসূয়া দেবী যদি খোঁজ করেন তো বোলো যে আমি তোমার কাছ থেকে খেয়ে গেছি।

—আচ্ছা। বললো উনা। মোহন বেরিয়ে গেল।

ঠিক মিনিট কুড়ি পরেই অনুসূয়া ঢুকলো ঘরে। সকালে শীলা চা খাবার-টাবার ঠিক ঠিক দিয়েছিল কিনা প্রথমেই জেনে নিয়ে বললো—জেঠু তোমাকে একবার তাঁর ঘরে যেতে বলেছেন।

—কখন ?

—এই দশটা সাড়ে দশটায়। ওঁর তো ঘুম থেকে উঠে স্তব-টব পড়তে পড়তে অনেক বেলা হয়ে যায়।

—আচ্ছা দিদি, আমি কি একটু বেড়িয়ে আসতে পারি ?

—কোন্ দিকে ?

—ওই দশপীঠের দিকটা।

অনুসূয়ার মুখের ওপর দিয়ে কি একখণ্ড মেঘ ভেসে গেল। কিন্তু তা এতই সূক্ষ্ম যে ভাল করে বোঝবার আগে জবাব এলো —আগের দিনে বাড়ির বৌ একথা বললে, ওই দশপীঠেরই কোন একটা ভাঙা স্তূপের নীচে সে থাকতো। কিন্তু আজ আর সে যুগ নেই, সে দিন নেই, সে মন, রুচি, শাসন কিছুই নেই। একা যেও না। চাঁদকে কি মোহনকে নিয়ে বেড়াতে যেও। কেমন ?

কিন্তু বেড়াতে যাবার সময় হাতের কাছে কাউকেই পাওয়া গেল না। একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল উনা। বাড়ির কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে সেই বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ। উনা হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি ভেতরে

ঢুকে পড়লে। সব মন্দিরই সমভূমি করা হয়নি। কিছু কিছু এখনো থামটাম সুদ্ধ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চলতে চলতে বাঁদিকের এমনি একটা মন্দিরের মধ্যে ঢুকলো উনা। সে ইতিহাসের ছাত্রী। ইতিহাস তার প্রিয় সাবজেক্ট। এখানে এই এলোমেলো ভাঙাচোরার মধ্যে সে ইতিহাসের গন্ধ পেয়েছে। কাজেই কৌতুহলের শেষ নেই তার।

মন্দিরের মাঝখানে যেখানটায় এসে দাঁড়ালো উনা, সেটা একটা বিরাট হলঘরের মতো। কী উঁচু ছাদ! পেছনদিকে মাথা হেলিয়ে চাইলে তবে ছাদ দেখা যায়। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো উনা। কী হ'তো এখানে? নিশ্চই কোন ক্লাস হ'তো। ভেতরদিকে ঢুকে গেল উনা। শ্বেতপাথরের সিঁড়িটা ঠিকই আছে কিন্তু। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখলো উনা। এটা বোধহয় কোন দেবতার মন্দির ছিল। দু'পাশের দেওয়াল ভাঙা, কিন্তু পেছনের দেওয়াল ঠিক আছে। প্রকাণ্ড একটা বেদী। বেদীর ঠিক পেছনে পাথরের আড়াল দেওয়া একটা সিঁড়ি। উনা মনের আনন্দে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা পথে এসে পড়লো যেটা সরু এবং লম্বা। কিন্তু আশ্চর্যরকম পরিচ্ছন্ন। থমকে দাঁড়ালো উনা। এতো পরিস্কার তো থাকার কথা নয় এ পথের। হঠাৎ তার মনে হ'লো কে যেন তাকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছে। ছমছম করে উঠলো গায়ের মধ্যে। সে হাতঘড়ি দেখলো—বেলা দশটা বাজে। না আর নয়। সাড়ে দশটায় শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করতে হবে তার। উনা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

বেশ কিছুক্ষণ তাড়াতাড়ি হাঁটার পর বুঝতে পারলো সে পথ হারিয়েছে। বাড়ির দিকে না গিয়ে সে দশপীঠের আরো ভেতর দিকে ঢুকে পড়েছে। উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তায় মুখে চোখে ঘাম দেখা দিল। বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করতে লাগলো। আরো আধ-

ঘণ্টা প্রাণপণে হাঁটার পর সে বুঝলো সে আরো মন্দিরের জটি-লতার মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। মাথার মধ্যে দপদপ করছে। ঘড়ি দেখলো উনা। বেলা এগারোটা বেজে গেছে। মাথার ওপরে সূর্য। হতাশ হয়ে উনা একটা প্রকাণ্ড উঠোনের কালো পাথরের বেদীর ওপর বসে পড়লো। মাথা খারাপ হ'লে চলবে না। পাগল হ'য়ে গেলে চলবে না। বেশ ভাল করে ভেবে নিতে হবে কোন্ কোন্ পথ দিয়ে সে এসেছে। কিন্তু না, কিছুই মনে পড়ছে না তার।

ধীরে ধীরে একটা অবসাদ এসে তাকে জড়িয়ে ধরছে। অনেক হেঁটেছে, আর পারবে না। এইবার শুয়ে পড়তে হবে। হয়তো আজই জীবনের শেষ দিন। হয়তো এত বেলা অবধি সে বাড়ি ফিরছে না দেখে ওরা সবাই খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কী করে পাবে তাকে? সে এই পাঁচ মাইল বিস্তীর্ণ ধ্বংসের মধ্যে কোন্ মন্দিরের পাশে, কোন্ থামের ধারে, কোন্ দেবীর থানের আড়ালে পড়ে পড়ে ধুঁকছে—এ তারা কেমন করে জানতে পারবে?

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো উনা। কোথায় যেন মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে! কাছেই কোথাও বহুলোক সমবেত হয়ে একসঙ্গে উচ্চারণ করছে থেকে থেকে—"ও-ও-ও-ও-ওম্"! কারা? কোন অশরীরী সাধকের দল কায়াহীন সাধনায় রত হয়ে প্রণব উচ্চারণ করছে? আবার শুনলো উনা—"ও-ও-ও-ও-ওম্"! শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা জলের ধারা ওঠা-নামা করছে। কাছেই কোথাও শব্দ হচ্ছে।

একপা একপা করে উনা এগিয়ে গিয়ে কতকগুলো বড় বড় ভাঙা থামের মাঝখানে দাঁড়ালো। এইখান থেকেই আওয়াজ উঠছে। আবার উচ্চারিত হলো "ও-ও-ও-ও-ওম্"। পাগল করে দেবে দেখছি। উনা দুর্বলচিত্তের মেয়ে নয়। সেও জমিদারের মেয়ে, বড় বংশের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই একা একা প্রান্তরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কাজেই ভয় তার এমনিতেই কম। কিন্তু

আজ এই পথ হারানোর পর এই অলক্ষ্য মুখ নিঃসৃত সোচ্চার 'ওম্' শুনে সত্যিই তার গা ভারী হয়ে উঠেছে। তবু সাহসে ভর করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিক দেখতে দেখতে এগোতে লাগলো। আবার শব্দ হতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে শব্দের উৎসটাকে দেখতে পেলো। একটা ভাঙা থামের নীচে বৃষ্টির জল যাবার নলের মধ্যে হাওয়া ঢুকে এই শব্দ হচ্ছে। এক টুকরো ইঁট কুড়িয়ে নলের মুখে গুঁজে দিতেই শব্দটা থেমে গেল।

নিজের মনেই হাসলো উনা। অলৌকিকত্ব এইভাবেই প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু বাড়ি ফিরবে কেমন করে সে? বেলা বারোটা বাজে! দুপুর গড়িয়ে যাবে এবার! এখান থেকে চীৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না।

কাছেই কোথায় 'গুড়ুম' করে একটা বন্দুকের শব্দ হতেই উনা ছুটে গিয়ে একটা বড় থামের আড়ালে লুকোলো। তাকে খুন করবার জন্য কেউ পিছু নিয়েছে নাকি? কিন্তু কেন? সে তো কোন অপরাধ করেনি। আবার বন্দুকের শব্দ আরো কাছে হতেই নিজের অজান্তেই তার গলা দিয়ে একটা চীৎকার বেরিয়ে এলো।

আবার সব নিশ্চুপ। কোথাও কোন শব্দ নেই। থামের পাশে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উনা। বেশ কিছুক্ষণ কেটেছে। হঠাৎ উনার পেছন থেকে একটা মোটা গলার আওয়াজ এলো—কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো?

উনা ফিরে চাইলো। দেখলো অপূর্ব রূপবান এক যুবক দাঁড়িয়ে। ডান হাতে একটা রাইফেল, বাঁ হাতে চারটে মরা তিতির ঝুলিয়ে তার দিকে অবাক চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত সুগঠিত দেহ। ফরসা রং, তীক্ষ্ণ নাক, বড় বড় চোখ। কিন্তু সমস্ত মুখে ও শরীরে যেন একটা দম্ভের স্বাক্ষর। তার দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গী থেকে বোঝা যায় এ মানুষ চট্ করে বশ মানার মানুষ নয়।

উনা তার চোখের দিকে চোখ রেখে বললো—আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।

—কেতাপ্প করেছ। কালীপুরেই থাকো?

—হ্যাঁ।

—এসো আমার সঙ্গে। কালীপুর এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। এসো। এই বলে যুবক হনহন করে এগিয়ে যেতে যেতে বললো—তাড়াতাড়ি এসো।

ওর সঙ্গে না গেলে এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোনো অসম্ভব বলে, উনা তার পেছন পেছন চললো। একটু তফাতেই দেখা গেল একটা শাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। যুবক কাছে গিয়ে ঘোড়ার গায়ে ঝোলানো একটা ঝোলার মধ্যে মরা তিতির চারটে ফেলে দিয়ে উনার দিকে চেয়ে বললো—ঘোড়ায় চড়তে জানো? না ওই লেডিজ সাইকেল অবধি?

—জানি। উনারও কেমন যেন জেদ চেপে গেল। লোকটা আশ্চর্য দাম্ভিক। মানুষকে মানুষ বলেই মনে করে না দেখছি।

—জানো? দৃষ্টির মধ্যে ব্যঙ্গ ফুটে উঠলো। —তাহলে ওঠো। দেখি।

উনা এগিয়ে গিয়ে রেকাবে পা দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লো ঘোড়ার পিঠে।

—আচ্ছা! সাবাস্! দাঁড়াও এবার আমি উঠি। এই বলে সেও লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। যেতে যেতে বললো—এখন যদি কেউ ছাখে আমাদের, তাহলে কী বলবে?

উনার বেশ ভালই লাগছিল। বললো—বলবে সংযুক্তা আর পৃথ্বীরাজ যাচ্ছে।

—বা! বহুৎ আচ্ছা! তুমি তো বাবা কালীপুরের মেয়ে নও!

—না। আমি কালীপুরের বৌ। উনা জবাব দিল।

—তাই বলো! আরো কিছুক্ষণ পরে দূরে রায় বাড়ির গম্বুজ

দেখা গেল। আরো খানিকটা এগিয়ে যুবক বললো—আমি কালী-পুরে ঢুকবো না। তুমি এইখানেই নেমে যাও। আমি সোজা বেরিয়ে যাব। এই বলে ঘোড়া থেকে নীচে নেমে হাত বাড়াবার আগেই উনা আগের মতোই অবলীলাক্রমে নীচে লাফিয়ে পড়লো।

—কালীপুরের কোন্ বাড়ির বৌ তুমি? কী তোমার স্বামীর নাম? নাকি বলতে পারবে না?

—কেন পারবো না? আমার স্বামীর নাম চন্দ্রচূড় রায়। লিফট্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

স্পষ্ট দেখলো উনা, যুবক এই কথায় বিষম চমকে উঠলো। তারপর যতদূর দেখা গেল উনাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইলো। বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢোকবার আগে উনা আর একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখলো যুবক সেই-ভাবে ঘোড়ার পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে আছে।

উনাকে বাড়ি ফিরতে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। অনুসূয়া বলরামকে বললো—দৌড়ে গিয়ে জেঠুকে খবর দে যে রানীমা ফিরেছে। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। বেরিয়ে আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। শেষকালে এক ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেয়ে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

—চাঁদ আর মোহন দুজনেই গিয়েছিল। কোথাও খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসেছে। কী সর্বনাশ বলো দিকিনি! কী করে হারিয়ে গেলে?

—কী জানি! দেখতে দেখতে এত ভেতরে ঢুকে গেছি যে, যতই বেরোবার চেষ্টা করছি ততই যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো।

—ছি ছি ছি! তুমি শীগ্‌গির জেঠুর কাছে যাও। তোমায় পাওয়া যায়নি শুনে খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন।

—আমি যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি। বলে তাড়াতাড়ি উনা শ্বশুরের ঘরের দিকে চলে গেল।

বিছানার ওপর আধশোয়া অবস্থায় বিশ্রাম করছিলেন অম্বিকা-প্রসাদ। উনা 'বাবা' বলে ডেকে ভেতরে ঢুকতেই তিনি বললেন —এসো, এসো, আমার কাছে এসো মা। এই বলে উনাকে কাছে বসিয়ে বললেন—কী হয়েছিল মাদার? শুনলাম একাই বেড়াতে বেরিয়েছিলে? দশপীঠের জাঙালে ঢুকেছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। আমি পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় এক ভদ্রলোক পাখী শিকার করতে এসে আমাকে দেখতে পান। তিনিই পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

একটুকাল চুপ করে থেকে অম্বিকা বললেন—তোমাকে একটা কথা বলি বৌমা। ওই দশপীঠের ধ্বংসের মধ্যে তুমি আর ঢুকো না। পূর্বপুরুষের কাজ মা। তাতে তো আমাদের কোন হাত ছিল না। কিন্তু কালাপাহাড়কে দিয়ে এগুলো ভেঙে ফেলার মধ্যে যে কী তাৎপর্য ছিল, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। অবশ্য কোন আচার্য অথবা কোন অধ্যাপক যদি কোন অপরাধ করে থাকেন, যদি কোন অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে সেই বিশেষ মানুষটিকে শাস্তি না দিয়ে, কেন এভাবে তন্ত্রসাধনার পীঠটাকে পর্যন্ত ধ্বংস করা হ'লো সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু এখনো ওখানে নাকি নানারকম 'ইলিউশান, দেখা যায়।

—দেখা যায়?

—দেখা যায়। আমি নিজে দেখিনি। কিন্তু যে ভদ্রলোক আমার চিকিৎসা করেন—শুধু আমার কেন, তিনি এই বাড়িরই পুরোহিত। কিছু শেকড়বাকড়ও জানেন। আসলে তিনিই এখন এই অঞ্চলের তন্ত্রসাধক। তিনি আমাকে বলছিলেন যে এক অমাবস্যার রাত্রে তিনি ছিন্নমস্তার মূর্তিকে আবির্ভূতা হ'তে দেখেছিলেন।

—সেকি বাবা! আজো—এই যুগে কি ওই সব—

—দেবতা যদি মানো মা, তাহলে তা সব যুগেই ছিল এবং আছে। না মানলে অবিশ্যি আলাদা কথা। তুমি কি এসব মানো মা?

—না বাবা। বললো উনা।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু পরে তোমাকে মানতেই হবে মা। এ বাড়ির বৌ হ'য়ে এসেছ তুমি। যদি মায়ের কৃপায় সন্তান ধারণ করতে পারো, তাহলে মানতেই হবে। আসলে কি জান মা? ভারী অল্পায়ুর বংশ আমাদের। ত্র্যম্বকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

—কে ত্র্যম্বক?

—আমার ছোটভাই। ওই অনুর বাবা। আজই দেখা হবে। সে এসব তন্ত্রটন্ত্র, নখদর্পণ ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কালীপুরের লোক তাকে বলে পাগল। কিন্তু আমি জানি মা, ও পাগল নয়। অনেক সময় বিচিত্র সব ভবিষ্যদ্বাণী করে, এবং দেখেছি সেগুলো ফলেও যায়। আলাপ হ'লে দেখবে।

—বাবা!

—কী মাদার?

—আপনাদের বড়দিদি—

—হ্যাঁ। ভুবনদিদি। ভুবনেশ্বরী। সে থাকে এখান থেকে আধ মাইলটাক দূরে তারাপুরে। সেটাও বেশ বড় স্টেট। বংশের যা কিছু আভিজাত্য, দম্ভ, সব তুমি দেখতে পাবে ভুবনদির সঙ্গে কথা বললে।

—তিনি আসবেন না আমাকে দেখতে?

—ভুবনদি তার নাতিকে নিয়ে পূজোর চারদিন এখানে এসে থাকে। আগে পূজো হ'তো আমাদের বাড়িতে। এখন আর পেরে উঠি না। তবে ঘটের ওপর পূজো হয়। সেই উপলক্ষে দু'চারজন আত্মীয়স্বজন আসেন। ওই চারটে দিন সেই পুরোনো দিনের মেজাজটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়। আচ্ছা, অনেক বেলা হয়ে

গেছে। এবার তুমি যাও—খাওয়া-দাওয়া করোগে। তোমাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে এমন আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল তোমাকে হয়তো আর পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে তোমার ডেড্‌বডি। তুমি একা ওদিকে আর যেও না মাদার। যদি কোন ভয়টয় পাও।

উনা কোন কথা বললো না। চুপচাপ উঠে চলে এলো শ্বশুরের কাছ থেকে। এ বাড়িতে আসার চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি এখনো, কিন্তু এরই মধ্যে তার মনে হয়েছে, এই বাড়িটার মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে, যা এখনো এরাই হয়তো জানে না।

সকলেরই খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। বাকী ছিল শুধু অনুসূয়া আর উনা। দুজনে খেয়ে উঠলো। শোবার ঘরে গিয়ে দেখলো চন্দ্রচূড় ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বসে বসে ইংরেজী নভেল পড়তে লাগলো। চোখ বইয়ের পাতায় রইলো বটে, কিন্তু মন তার ঘুরপাক খেতে লাগলো বাড়িটার মধ্যে। এটা কত বড় বাড়ি? কতগুলো ঘর এই বাড়িটাতে? সে লক্ষ্য করেছে চারদিকে চারটে মহল বাড়িটার। আর কোন মেম্বার নেই।

দরজায় ঠুকঠুক করে আওয়াজ হচ্ছে। শীলা বোধহয়। সে উঠে গিয়ে দরজা খুলে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে উনা চেনে না। ড্রেসিং গাউন পরা। চুলগুলো উস্কখুস্ক; চোখে অত্যন্ত পুরু কাচের চশমা। উনাকে দেখে তিনি হাসলেন। দেখা গেল সামনের তিনটি দাঁত নেই। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন—বৌমা?

—হ্যাঁ। অস্বস্তি বোধ করছে উনা।

—আমার নাম ত্র্যম্বক রায়।

—ও! বলে উনা ঘর থেকে বেরিয়ে প্রণাম করলো খুড়শ্বশুরকে। তিনি বললেন—আমি তোমায় ডাকতে এসেছি। এসো আমার সঙ্গে। আমার ঘর উত্তর মহলে।

—এখন—বলতে চেষ্টা করলো উনা। আসল কথা লোকটিকে গোড়া থেকেই তার ভাল লাগছে না। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। তার ওপর গায়ের ফরসা রং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। তবু উনার মন বললে—যাওয়াই যাক না সঙ্গে। দেখাই যাক না কী হয়!

—চলুন! বলে আস্তে আস্তে ত্র্যম্বককে অনুসরণ করলো উনা। ভেতর দিকে এই প্রথম এলো সে। দক্ষিণ মহল ছাড়িয়ে পড়লো উঠোনে। বিরাট বিশাল উঠোন। হেঁটে পার হতে সময় লাগে। কিন্তু ত্রাম্বক বয়সের তুলনায় বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটেন।

আবার সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে তাঁর ঘর। ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই চমকে উঠলো উনা। প্রথমেই যা চোখে পড়লো তা হচ্ছে কালো কষ্টিপাথরের একটি কালীমূর্তি। শব ও শিবের উপর আসীনা। তন্ত্রের দেবীমূর্তি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নেই উনার। থাকলে বুঝতে পারতো কালী বিপরীত-রতাতুরা। সামনে একটি আসন পাঁচটি নরমুণ্ডের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে গা গুলিয়ে উঠলো উনার। বললো—কাকু! আমি এখন যাই। আর একসময়ে আসবো।

আবার সেই ফ্যাসফেঁসে হাসি হাসলেন ত্র্যম্বক। বললেন—বুঝেছি। তুমি ভয় পেয়েছো মা? কিন্তু ভয়ের কী আছে? তুমিও মা—ও বেটিও মা। বোসো—বোসো।

ঘরের মেঝেতে একটি বাঘের চামড়া বিছানো। তার উপর বসলো উনা। ত্র্যম্বকও বসলেন।—এটা আমার পুজোর ঘর। শোবার ঘরটা পাশেই। আমার এখানে কেউ আসে না মা। কেউ না। এমন কি আমার নিজের মেয়ে, নাতি পর্যন্ত না। কেন আসবে বলো? আমাকে ওরা পাগল ভেবে পরিত্যাগ করেছে। বলতে বলতে ত্র্যম্বক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।—কিন্তু তুমি বিশ্বাস

করো মা, আমি পাগল নই। না না পাগল নই আমি। মুশকিল হয়েছে কি জান—মাকে ডাকতে ডাকতে কী যেন একটা হয়ে গেছে আমার। ওই পুজোর আসনে চোখ বুজে বসলে, আমি সব দেখতে পাই। সব মা আমাকে দেখিয়ে দেয়। সূর্য যে গোল বারান্দা থেকে ঝাঁপ খাবে তা আমি বলে দিয়েছিলাম। দাদাকে পনেরো দিন আগে বলেছিলাম—ওই বারান্দায় বেরোবার দরজাটা গেঁথে দাও ইঁট দিয়ে। দাদা শুনে হেসে বললেন—তুই চুপ কর ত্র্যম্বু। বাড়ির সমস্ত দরজা জানালা ইঁট দিয়ে গেঁথে কি বাস করা চলে?

এই অবধি বলে থামলেন ত্র্যম্বক। বললেন—পরে অবিশ্যি দাদা বলেছিলেন—তোর কথা শুনলে পারতাম ত্র্যম্বু। তাহলে এই শোকটা এড়াতে পারতাম।

উনার মনে হলো—ত্র্যম্বক তাকে যেন কিছু বলবার জন্য ডেকে এনেছেন। তাই ত্র্যম্বকের চোখের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলো—আমায় কি কিছু বলবার জন্য আজ ডেকে নিয়ে এলেন কাকু?

চমকে উঠলেন ত্র্যম্বক। যেন বিব্রত বোধ করলেন। তারপর বললেন—

—হ্যাঁ। তুমি আজ দশপীঠের জাঙালে গিয়েছিলে মা?

—হ্যাঁ।

—পথ হারিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—ভয় পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—তারা! বলে চীৎকার করে উঠলেন ত্র্যম্বক।—দ্যাখো, মা তাহলে আমায় নখদর্পণে ঠিক দেখিয়েছেন। আচ্ছা দাঁড়াও। ঘোড়ায় চেপে তোমায় সামনে বসিয়ে কোন লোক কি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা—তার জামা কাপড়ে আমি রক্তের ছিটে কেন দেখলাম বল তো ?

—চারটে পাখী মেরে হাতে ঝুলিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তারই—

—ঠিক। তার থেকেই লেগেছে।

এই বলে ত্র্যম্বক উঠে গিয়ে কালীমূর্তির আসনের নীচে একটি রূপোর তাম্রকুণ্ড থেকে রূপোর কুশিতে করে একটু চরণামৃত নিয়ে এসে বললেন - খাও। মায়ের চরণামৃত। সংসারে কিছু থাকবে না। কেউ থাকবে না। থাকবে শুধু মা—আর মায়ের অসীম লীলা। এই বলে একটু চুপ করে থেকে বললেন—দুর্যোগ আসছে বৌমা। দুর্ভাগ্য আসছে। রুধিরবিলাসিনী তারা রক্তের জন্য পাত্র বাড়িয়েছেন। সেই পাত্র ভরে দিতে হবে।

গুরগুর করে কেঁপে উঠলো উনার বুকের মধ্যে। সে শুকনো মুখে বললো—কী বলছেন কাকু! আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কার রক্ত—কার রক্তের জন্য মা পাত্র বাড়িয়েছেন ? একটু সামলে নিয়ে বললো—কাকু, এসব তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে আমি অভ্যস্ত নই। আপনার ভাইপোকে ভালবেসে বিয়ে করেছি। তখন যদি একটুও জানতে পারতাম যে এত ভয় আর এত ভাবনায় ভরা এই কালীপুর, আর এই রায় ফ্যামিলী, তাহলে আমি কিছুতেই— ।

হা হা করে হেসে উঠলেন ত্র্যম্বকপ্রসাদ। বললেন—এইতো, আমার মায়ের মনে ভয় ঢুকে গেছে। ওরে পাগলী, নিয়তিকে কি প্রতিরোধ করতে পারিস ? সে যে অঘটনঘটনপটীয়সী ! রায় বাড়ির কুলবধূ হওয়া তোমার প্রাক্তন—হাজার চেষ্টা করলেও তো সে ভবিতব্য তুমি খণ্ডন করতে পারতে না। এই অবধি বলে তিনি একটা চাপা চীৎকার করে উঠলেন—তারা ! তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—

মৃত্যু আর ধ্বংস দিয়ে কালীপুরের প্রতিষ্ঠা। মৃত্যু আর ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই রায় পরিবারকে এগিয়ে যেতে হবে।

—কাকা! আপনি যেন কী একটা কথা গোপন করতে চাইছেন। আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। আমাকে সব কথা বলুন। যদি সাবধান হওয়ার কিছু থাকে, তাহলে তাও বলুন। আমাকে সাবধান হবার সুযোগ দিন।

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে ত্র্যম্বক চেয়ে রইলেন মাতৃমূর্তির দিকে। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—বলবো মা? বৌমাকে কি বলা যাবে সে কথা? তুই যদি বলিস তো বলে দিই। আচ্ছা—আচ্ছা। এই বলে উনার দিকে ফিরে বললেন—শোন বৌমা, মা আমাকে বলেছেন—

সশব্দে ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকলো অনুসূয়া। সে একটুকাল অবাক হয়ে এদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর উনার দিকে চেয়ে যেন একটু শক্ত সুরেই বললো—তুমি তো আচ্ছা মেয়ে! সারা বাড়ি তোলপাড় করে খোঁজা হচ্ছে তোমাকে, আর তুমি এই ঘরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। নতুন বৌ তুমি—এত ছটফট করা কি ভাল?

সঙ্গে সঙ্গে উনা শক্ত হয়ে গেল। নীরস গলায় বললো—আমি ইচ্ছে করে আসিনি। ইচ্ছে থাকলেও এই গোলকধাঁধার মধ্যে এই ঘর খুঁজে পেতাম না। কাকাই আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছেন কালীমূর্তি দেখাবার জন্য। আমার মত সামান্য মানুষকে এত খোঁজাখুঁজি হবে এটা জানলে আমি নিশ্চয় আসতাম না।

মুহূর্তকালের জন্যে থমকে গেল অনুসূয়া। বড় বড় দুটো চোখ মেলে একবার দেখে নিল উনাকে। তারপর শান্তগলায় বললো—তুমি রেগে উঠলে কেন? তোমার বাড়ি, তোমার ঘরে যদি তোমাকে খোঁজা হয়, তাহলে সেটা কি খুব অন্যায় হবে? এসো। এই বলে অনুসূয়া যখন দেখলো যে উনা বসেই আছে,

তখন সে এগিয়ে গিয়ে তার হাতখানা ধরে টেনে বললো—এসো এসো। জেঠু বসে আছেন তোমার জন্য।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অনসূয়া বললো—তুমি শুধু শুধু রাগ করলে আমার ওপর।

—না, রাগ করিনি দিদি। কাকুর সঙ্গে তো আলাপ ছিল না আমার। তাই উনি যখন ডেকে নিয়ে গেলেন—। ঘরে ঢুকে এমন অদ্ভুত লাগলো আমার। চুপ করে বসে ওঁর কথা শুনছিলাম।

—না বৌরানী। তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমি তোমাকে বারণই করবো বাবার ঘরে আসতে। উনি সেই যুগের তন্ত্রমন্ত্র, নখদর্পণ-টর্পণ এসবে বিশ্বাসী। কিছু কিছু প্র্যাকটিসও করেন। কিন্তু এ যুগের ছেলে-মেয়েদের মনের সঙ্গে এসবের কোন যোগ নেই। ফলে শক্‌ড্ হতে হয়।

—শুধু এই ? নামতে নামতে অন্যমনস্কভাবে বললো উনা।

—না, শুধু এই-ই নয়। উনি অনেক সময় প্রফেসি করেন, সেটা আশ্চর্যভাবে মিলেও যায়। এবাড়ির কোন উৎসবে, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ওঁকে ডাকা হয় না। উনি একলা একলা নিজের ঘরেই কাটান।

একতলায় এসে পৌঁছালো ওরা। উনা প্রশ্ন করলো—কেন, ডাকা হয় না কেন ?

—ডাকা হয় না এই জন্যে যে, উনি কখন কী মুডে থাকেন সেটা জানা যায় না। ফলে কাকে কী বলতে কী বলে ফেলেন, তাই নিয়ে মুশকিল বাধে। যা বলেন তা ফলেও যায় অনেক সময়।

—এমন মিলেছে কারো ?

—অনেক। তারাপুরে আমাদের পিসী আছে ভুবনেশ্বরী দেবী। তাঁর একমাত্র মেয়ে কমলা যখন লাভ ম্যারেজ করলো, তার

আগেও উনি বলেছিলেন। তাছাড়া কমলাদি মারা যাবার আগেও বাবা পিসীমাকে ডেকে বলেছিলেন তার মরার সম্ভাবনার কথা।

—ও!

কিন্তু কেন জানা নেই, ধড়াস করে কেঁপে উঠলো উনার বুকের মধ্যে। কিন্তু সে মুখে কোন কথা বললো না। অনুসূয়ার সঙ্গে শ্বশুরের কাছে গিয়ে হাজির হলো।

রাত্রে শুতে যাবার আগে ঘরের সামনের ব্যালকনিতে বসে ছিল উনা, চন্দ্রচূড় আর মোহন। তিনজনে বসে বসে কথা বলছিল। মোহন বললো—মামী, তোমায় আবার একবার সাবধান করে দিই। দশপীঠের দিকে একা একা যেও না তুমি। তুমি কোলকাতায় পড়া মেয়ে, মানো আর নাই মানো, আমরা মানি।

—কী মানো?

—মানি যে দশপীঠের মধ্যে এখনো অনেক তান্ত্রিক সাধকের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়। তারা সব সময় সবাইকে দেখা না দিলেও কাউকে কাউকে দেয়।—তারপর—

—তারপর কী? বলো!

—না থাক!

—থাকবে কেন? বলোই না!

—কী বলবি বল্ না। চন্দ্রচূড় বললো।

একটু ইতস্ততঃ করে বললো মোহন!—আমি শুনেছি তারাই এক তান্ত্রিক সাধকের দেখা পায়, যাদের নাকি সময়টা খারাপ। তাছাড়া যে ত্যাখে তার নাকি খুব ক্ষতিও হয়। খুব বড় কোন ক্ষতি বা মৃত্যু এসব ঘটবার আগে অনেকেই দেখা পেয়েছে সেই তান্ত্রিক সাধকের।

হঠাৎ মনে হলো উনার সে বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। নইলে চারদিকে এসব কী হচ্ছে? এতগুলো লোক মিলে কী

বোঝাতে চাইছে তাকে? চাঁদকে বলবে যে সে বাড়ি যেতে চায়? কী ভাববে ও?

রাত্রে শুয়ে উনা জিগ্যেস করলো স্বামীকে—তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করবো?

—করো। কিন্তু কী জিগ্যেস করবে আমি জানি।

—কী বল তো?

—তান্ত্রিকের কথা তো?

—হ্যাঁ। সত্যিই কি এরকম কিছু আছে? এরকম ত্থাখে লোক?

—তাইতো শুনেছি।

আর কোন কথা হ'লো না। নববিবাহিত স্বামী স্ত্রীর মাঝ-খানে এক তান্ত্রিক সাধক এসে আসন করে বসলো।

গভীর রাত্রে চন্দ্রচূড়ের চাপা ডাকে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলো উনা। চেয়ে দেখলো স্বামীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

—কী হয়েছে?

—শুনতে পাচ্ছো না?

—নাঃ!

—কী আশ্চর্য! শুনতে পাচ্ছো না, আমাদের অ্যালসেশিয়ান কুকুর জুলি কী রকম ওপরে নীচে ছুটোছুটি করে ডাকছে!

শুনলো উনা। জুলি যেন ক্ষেপে গিয়ে একবার ওপরে ছুটে আসছে আবার নীচে নেমে যাচ্ছে।

—দরজাটা খুলে দাও তো জুলিকে।

ভয়ে গলা কাঁপছে চন্দ্রচূড়ের। অবাক চোখে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে উনা দরজা খুলে দিতেই জুলি ঝাঁপিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘরের উত্তর দিকের দরজার দিকে ছুটে গেল।

—ও দরজাটাও খুলে দাও!

—ও তো খোলাই থাকে। খিল নেই।

জুলি ছুটে ঘর থেকে বেরোলো। উনা তার পেছনে। চন্দ্র-চূড় চেঁচিয়ে বললো—জুলির পেছনে পেছনে তুমি কোথায় যাচ্ছো ?

—দেখি না ব্যাপারটা !

বাড়ির এদিকটা অব্যবহৃত। লম্বা লম্বা বারান্দা, সারি সারি ঘর। কোনটা খোলা, কোনটা তালাবন্ধ। জুলি একটা ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। গোঁ গোঁ করতে লাগলো। উনা দেখলো ঘরটার দরজায় তালা নেই। ঢুকবে কী ঢুকবে না ভেবে স্বামীকে ডাকলো—তুমি একবার এসো না !

—কেন ? ঘর থেকেই জবাব দিল চন্দ্রচূড়।

—এসোই না।

বেরিয়ে এলো চন্দ্রচূড়।—কী ?

—এসো না, এই ঘরটায় ঢুকে দেখি কী আছে ?

—ও ঘরটায়—! দাঁড়াও, আলোটা নিয়ে আসি।

আলো নিতে এসে দেখলো চন্দ্রচূড় ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অনুসূয়া। চাঁদকে দেখে বললো—কী ব্যাপারটা আমায় একটু বলবি ? এত রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে ঘরে আর বারান্দায় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিস কেন ?

অপ্রস্তুত হয়ে গেল চন্দ্রচূড়। বললো—কুকুরটা এমন ডাকছিল—

—কুকুর ডাকবে তার মধ্যে আশ্চর্যের ব্যাপার কী আছে ? অনুসূয়া যেন রেগেই উঠলো।—রাত্রিবেলায় কুকুর ডাকাই তো স্বাভাবিক।

—না দিদি। বললো উনা।—খুব ছুটোছুটি করছিল।

—সে তো একটা ইঁদুর দেখলেও কুকুরটা করতে পারে ভাই।

—হ্যাঁ, তা পারে।

নিভে গেল উনা। কিন্তু মন থেকে তার সন্দেহ গেল না। সে কাউকে বললো না যে চার নম্বর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে সে পায়ের ছাপ দেখেছে। প্রবীণবয়স্ক মানুষের পায়ের ছাপ।

কিন্তু কথাটা মনে মনেই রেখে দিল উনা, কাউকে কিচ্ছু বললো না।

শ্বশুর বলেছিলেন—প্রত্যেকদিন ভোরে উঠে খানিকটা পথ বেড়িয়ে এসো বৌমা। দশপীঠের ওদিকে যেয়ো না। ওদিকটা বড় গোলমেলে। আবার পথ হারালে মুশকিলে পড়বে। অনুসূয়া বাধা দিয়ে বলেছিল—কিন্তু জেঠু, উনা নতুন বৌ। ওর এভাবে বেড়ানো—।

—সে যুগ আর নেই মা। মেয়েরা আকাশে উঠছে। তা ছাড়া আমাদের বাড়িটা তো গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে, কাজেই কেউ লক্ষ্য করবে না।

অনুসূয়া আর কোন প্রতিবাদ করেনি। অনুসূয়াকে বড় অদ্ভুত মনে হয় উনার। সব সময় চাপা। কোন সময়েই মনের কথা স্পষ্ট করে বলে না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টাই কী যেন মনে মনে ভাঁজছে। অনুসূয়ার ছেলে মোহন, সেও যেন কী রকম। তার যত ঈর্ষা যেন চাঁদের ওপর। বিচিত্র বাড়ি।

তখনো ভোর ছটা বাজেনি। উনা সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দিয়ে না গিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এটা বাড়ির পেছন দিক। প্রকাণ্ড মাঠ—মাঝে মাঝে তাল আর খেজুর গাছ। আকাশ পরিষ্কার—নীল। নানারকম পাখীর ডাক শোনা যায়।

আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে উনা। বেশ কিছুদূর যাবার পর পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ফিরে চাইলো উনা। মনে হলো সেই অসহ্য দাম্ভিক লোকটা আসছে ঘোড়ায় চেপে। সে মেঠো পথ ছেড়ে পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। ছোটার গতি অনেক কমিয়ে দিয়েছিল আরোহী। পাশ দিয়ে যাবার সময় উনাকে দেখে সে ভ্রূকুটি করলো। ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল। ওপর থেকেই সে উনার দিকে চেয়ে সামান্য হেসে বললো—চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ। বললো উনা।

নীচে নামলো সে। তারপর উনার দিকে চেয়ে বললো—রায় বাড়ির কুলবধূ পায়ে হেঁটে কোথায় চলেছে?

—মর্নিং ওয়াক্।

—কিন্তু যে রকম সঞ্চারিণী পল্লবিনী দেহ, তাতে দিনকয়েকের মধ্যেই যে মর্নিং ওয়াক্ মোর্নিং ওয়াকে পরিণত হবে।

—তাতেই বা আপনার কী?

—কিছুই না। সুন্দরী মেয়েরা পায়ে হাঁটলে আমার কষ্ট হয়।

উনা একথার কোন জবাব দিল না। দুজনেই হাঁটতে শুরু করলো। একটু পরেই যুবক আবার প্রশ্ন করলো—চাঁদের সঙ্গে পরিচয় কতদিনের?

—খুব অল্পদিনের।

—তবু? কতদিন আলাপের পর বিয়ে হয়েছে?

—ঠিক মনে নেই। দিন পনরো হবে।

—তার আগেই খবর পাওয়া গিয়েছিল যে চাঁদের অনেক সম্পত্তি আছে?

—তার মানে?

—তার মানে—সম্পত্তির লোভ ছাড়া একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে এতদূরে অজ পাড়াগাঁয়ের জমিদারকে বিয়ে করবে কেন? উনা যেন কী বলতে যাচ্ছিল,—বাধা দিয়ে তাকে থামিয়ে বললো—না না, ভালবাসা-টাসা ওসব রূপকথার গপ্পো। ওসব বিশ্বেস করে কোন লাভ নেই। আসল কথা হচ্ছে টাকা, সম্পত্তি হীরে, জহরত। এই বলে কিছুক্ষণ হেঁটে একটা তালগাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বেঁধে এগিয়ে এসে বললো—একটু বসা যাক।

উনা বলতে গেল—'না'। কিন্তু পারলো না। অনেকক্ষণ থেকেই সে মনে মনে চটেছিল। কিন্তু কিছু না বলে মাটিতে শোয়ানো একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসলো।

—আপনার ধারণা ভুল। চাঁদকে বিয়ে করার অনেক পরে

আমি জানতে পারি যে সে জমিদারের ছেলে বা কিছু সম্পত্তি আছে তার।

—সত্যি? ঠাট্টার হাসি ফুটে উঠলো যুবকের মুখের রেখায়। বললো—তাহলে তো মহত্ত্বই বলতে হবে। এককথায় যাকে বলে স্বর্গীয় প্রেম।

—হ্যাঁ তাই। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে উনার।—সম্পত্তি বা টাকাকড়ি আমার নিজেরই অনেক আছে। আমার বাবাও জমিদার। বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে আমি।

—হুঁ হুঁ। কিন্তু এখানে বৃদ্ধ অম্বিকাপ্রসাদের সম্পত্তির ওপর আর এক জোড়া থাবা আগেই পাতা আছে, সে কি তা তুলে নেবে?

— কে?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল যুবক। তারপর নিজের মনেই বললো—মারামারি, কাটাকাটি, খুনজখম না করে কি সম্পত্তি পাবার আর কোন উপায় নেই পৃথিবীতে?

—কার কথা বলছেন আপনি? কেন বলছেন? আপনি কে? কী করে এই পরিবারের এত কথা জানলেন?

—আমি জানি। তোমাকে কয়েকটা কথা বলি—একটু—

—আপনি বলুন। তুমি বলছেন কেন?

—বলা উচিত না, তাই বলছি না। এই একফোঁটা মেয়েকে যদি আপনি বলতে হয়, তার চাইতে বনে যাওয়া অনেক ভাল। তর্ক কোরো না। যা বলি মন দিয়ে শোন। তোমার এখানে মিত্র কেউ নেই, বন্ধু কেউ নেই, হিতাকাঙ্ক্ষীও কেউ নেই। হেসে কথা বললেই ভুলে যেয়ো না। চোখের সামনে যা আসুক, জীবনে যা ঘটুক, ভাল করে বিচার না করে তাকে গ্রহণ কোরো না। চল উঠি। আজ তুমি হেঁটেই যাও। আমার সঙ্গে অফিসিয়ালি তোমার পরিচয় হবে। আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা

হয়েছে দু'দিন, আলাপ হয়েছে, একথা কাউকে বোলো না। এমনকি চাঁদকেও না। মনে থাকবে?

—থাকবে। কিন্তু আপনি কে?

—আমার নাম সুরঞ্জন। তারাপুরে আমার বাড়ি। এই বলে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো উনা। সুরঞ্জন! ভুবনেশ্বরীর নাতি! কী আশ্চর্য।

ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলো উনা।

বাইরের ঘরে নতুন একটি মানুষ বসে আছেন। তার শ্বশুরের চেয়ে কিছু ছোট। রেখাবহুল মুখ। অম্বিকাপ্রসাদের সঙ্গে তন্ময় হয়ে গল্প করছেন। গলাটা ভাঙা ভাঙা ফ্যাসফেঁসে আওয়াজ।

—তখন হালে পানি না পেয়ে ডাকতে হলো গোকুল চক্কোত্তিকে। গেলাম। দেখলাম অ্যালোপাথ ডাক্তার প্রায় শেষ করে এনেছে। তখন আর উপায় ছিল না। শেষ অস্ত্র বিষবড়ি দিলাম ঠুকে।

বললেন তিনি। শ্বশুরের গলা শোনা গেল—এখন ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ। কাল অন্নপথ্য করেছে। আরে বাবা, এ দেশ হলো বাংলাদেশ। ইংরিজী ওষুধ সব সময় কথা কইবে কেন? মনে নেই তোমার? সেই পা ফোলার সময় শ্যামলতার রস কী কাজ দিয়েছিল?

—মনে নেই আবার! খুব মনে আছে। দুটো পাই ফুলে ঢোল হয়ে গেল। না পারি উঠতে, না পারি বসতে। শ্যামলতার রস মালিশ করামাত্র ভ্যাখ ভ্যাখ করতে করতে কমে গেল।

একটু চুপচাপ। বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিল উনা। আবার কথা শোনা গেল গোকুল চক্রবর্তীর।—ছিলাম না দিন দশেক। এক শিষ্যবাড়ি যেতে হয়েছিল নলহাটিতে। এসে যা খবর শুনলাম, চাঁদ নাকি বিয়ে করে একেবারে বৌ নিয়ে ফিরে এসেছে?

—হ্যাঁ।

—এটা কী রকম হলো অম্বিকেদা? অজাত কুজাতের মেয়ে নয় তো?

—না না, ভাল ঘর। সম্ভ্রান্ত বংশ। ওরাও জমিদার। সেসব দিকে বেশ ভালই হয়েছে। বৌমাও অপূর্ব মেয়ে। যেমন সুন্দরী তেমনি স্মার্ট।

—ভাল ভাল। তবে কথা কি জান অম্বিকেদা! চাঁদের বিয়ে করাটাই উচিত হয়নি। হৃদপিণ্ড ওর ভীষণ দুর্বল। সুন্দরী যুবতী মেয়ে তো উপকার করতে পারবে না ওর, অপকারই করবে। একেই অল্পায়ুর বংশ তোমাদের। তার ওপর—

আর বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা উচিত নয়। উনা ঘরে ঢুকতেই গোকুল চক্রবর্তী চুপ করে গিয়ে চেয়ে রইলেন উনার দিকে।

—এসো বৌমা! প্রণাম করো। ইনিও তোমার সম্পর্কে শ্বশুর, এবং আমাদের কুলপুরোহিত গোকুল চক্রবর্তী।

উনা প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল গোকুলের। তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে উনার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলে মা?

—বেড়াতে।

—একা?

—হ্যাঁ। সামান্য হেসে বললো উনা।

—সেকি গো অম্বিকেদা? রায় বাড়ির বৌ একা একা বেড়াতে গেল, সঙ্গে একটা চাকর দিতে পারলে না?

অম্বিকাপ্রসাদ যেন অপ্রস্তুত হলেন। বললেন—ঠিক তা নয়। বৌমা একা একাই বেড়াতে ভালবাসে। আরে সেদিন তো দশ-পীঠের মধ্যে হারিয়েই গিয়েছিল। বেলা একটা পর্যন্ত আসে না দেখে আমি তো—! যাক্! তারপর এসে পড়লো।

—বা বা! দশপীঠেও একলা একলা যাচ্ছে।···তারা ব্রহ্মময়ী! কই মা অনু! পূজোর যোগাড় হলো?

ভাল লাগলো না লোকটিকে। প্রথম দৃষ্টিতেই ক্রূর বলে মনে হয়। মুখের হাসিটাও ভাল নয়। দ্ব্যর্থক মনে হয়। রেখাবহুল মুখে একটি অভিব্যক্তিই ফুটে ওঠে, সেটি বিদ্রূপের অভিব্যক্তি। ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজ—রেখাঙ্কিত মুখ—এই মানুষ কখনো ভাল হতে পারে না। উনাকে মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে গোকুল বললেন—কী দেখছো গো মা মুখের দিকে চেয়ে?

—আপনাকেই দেখছি।

—কেন? কী আছে দেখবার এই বুড়ো মানুষের মুখের মধ্যে? হেসে বললেন।

উনা কিন্তু হাসলো না। গোকুলের মুখের ওপরই চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললো—একজন ইংরেজ মনীষী বলেছিলেন মুখই হচ্ছে অন্তরের দর্পণ। তাই বোঝবার চেষ্টা করছিলাম।

হঠাৎ যেন মুখটা শুকিয়ে গেল গোকুল চক্রবর্তীর। থতমত খেয়ে বললেন—বাদ দাও, বাদ দাও। ইংরেজরা অমন আবোল-তাবোল বকে। ওসব পাকা পাকা কথা শুনলে বিরক্ত লাগে। তা অম্বিকেদা—বৌ তো আমাদের বেশ জ্ঞানী দেখতে পাচ্ছি। বেশ বেশ, বেঁচে থাকো মা। দীর্ঘজীবী হও। কই মা অনু! বলতে বলতে উঠে পড়লেন গোকুল চক্রবর্তী। তারপর সোজা অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন।

উনা দাঁড়িয়েই ছিল। মুখ ফিরিয়ে শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করলো—কিসের পূজো বাবা?

—এ্যাঁ! কিসের পূজো? তাইতো—কিসের পূজো আজকে? আমি তো মা এসব ভাল জানিও না। যা কিছু করে—অনুই করে। আচ্ছা আমি এক্ষুণি জেনে নিচ্ছি কিসের পূজো আজ!

—না না বাবা, এমন কিছু দরকারী কথা নয়। আমাদের কি মঙ্গলচণ্ডীর ঘট আছে?

—মঙ্গলচণ্ডী—! তা বোধহয় আছে। হ্যাঁ আছে। নিশ্চয়ই আছে। আচ্ছা মা, আমি খোঁজ নিয়ে—

—না না বাবা, কোন দরকার নেই। আমি এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

সেইদিন রাত্রে চন্দ্রচূড় যখন ঘরে এলো, তখন তার মুখ চোখ শুকনো। উনা ঘরেই ছিল। জিগ্যেস করলো—কী হয়েছে?

—কই, কিছু না তো!

—কিছু না তো মুখ চোখ এত শুকনো কেন? মনে হচ্ছে খুব ভয় পেয়েছ তুমি।

—ভয়? শুকনো মুখে চন্দ্রচূড় জবাব দিল!—না তো! ভয় পাব কেন?

—তবে কী হয়েছে বলো!

—বলছি কিছু হয়নি উনা।

—ছাখো, আমি তোমার স্ত্রী। আমার কাছে তোমার কিছু গোপন করা উচিত নয়। বিয়ের আগে তুমি বলেছিলে আমাকে পাশে পেলে তোমার বুকে বল বাড়বে। আজ কি সে কথা ভুলে গেলে তুমি?

—না না উনা। সত্যি বলছি। ভয়-টয় নয়। অনেকটা পথ হেঁটেছি আজ।

—হেঁটেছ?

—হ্যাঁ।

—কেন? ঘোড়া কী হলো তোমার?

—ঘোড়া নিয়ে যাইনি। এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেকটা পথ চলে গিয়েছিলাম। তারপর সে তার বাড়ি চলে গেল। ফলে এই দু'তিন মাইল পথ—

—দশপীঠের পাশ দিয়ে এসেছ বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—কিছু দেখেছ বুঝি সেখানে ?

চমকে উঠলো চন্দ্রচূড়। কোন জবাব দিতে না পেরে ফ্যাল-ফ্যাল করে উনার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—কী হলো গো ? কথা বলো ?

—এঁ্যা !

—কী দেখেছ বলো আমাকে। উনার কণ্ঠে দৃঢ়তা।

—না, সে আমারই চোখের ভুল।

—তবু ? কী দেখেছ ?

—আসতে আসতে আমার যেন মনে হলো, বড় বড় জটাওয়ালা, লাল কাপড় চাদর পরা একজন তান্ত্রিক একটা ভাঙা মন্দিরের ছায়া থেকে আর একটা ছায়ার দিকে চলে গেল।

—তান্ত্রিক ?

—হ্যাঁ। দশপীঠের ওঁরা তন্ত্রসাধনাই তো করতেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে উনা বললো—এসব তুমি বিশ্বাস করো ?

—কী সব ?

—এই ধরনের ইলিউশন ?

একটু থেমে চন্দ্রচূড় বললো –না।

পরের দিন সকালে তারাপুর থেকে একটা চিঠি নিয়ে একজন চাকর এলো। হাতের লেখাটা অন্যের, কিন্তু তলায় গোটা গোটা অক্ষরে নাম সই—শ্রীমতি ভুবনেশ্বরী দেবী (চৌধুরী)। চিঠিতে লেখা আছে,—

রায় পরিবারের নববধূ শ্রীমতি উনা দেবী (রায়) কে তারাপুরে আসিয়া একটি দিন কাটাইবার জন্য এই নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইল।

শ্রীমতী বধূমাতা আসিতে স্বীকৃতা হইলে আগামী কল্য প্রাতঃ আট ঘটিকার সময় গাড়ি তাঁহাকে আনিতে যাইবে। ইতি।

কিন্তু উনা চিঠির মধ্যে দেখলো সেই দম্ভ। সেই অহংয়ের লীলা। অম্বিকাপ্রসাদ চিঠি পড়ে বললেন—ভুবনদিদি বৌমাকে নিতে চেয়েছে, এ ভারী ভাল কথা, ঘুরে এসো মা।

ভ্যানিটিতে ঘা লাগলো উনার। বললো—আমার শরীরটা খুব ভাল নেই বাবা।

—ও! তাহলে থাক। ভুবনদিদিকে একটু মিষ্টি করে চিঠি লিখে দাও। যাতে রাগটাগ না করে। মেয়ে দুর্বাসা তো!

—আচ্ছা বাবা। বলে ওপরে গিয়ে উনা নিজের হাতে লিখে চিঠির জবাব দিল। লিখলো—

—রায় পরিবারের নববধূ শ্রীমতী উনা দেবী (রায়) গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছে যে এই ধরনের ইংরেজী প্রথার নিমন্ত্রণ গ্রহণে সে অক্ষম। সে মনে করে যেখানে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান, সেখানে আমন্ত্রণের ভাষায় আন্তরিকতার সুর থাকা উচিত। শ্রীযুক্তা ভুবনেশ্বরী দেবী (চৌধুরী)-র নিকট রায়বধূ তাহার অপারগতা জ্ঞাপন করিতেছে।

চিঠিখানি দুবার তিনবার পড়ে সে খামে বন্ধ করে অপেক্ষমান ভৃত্যের হাতে পৌঁছে দিল।

মনে মনে বললো—জানি, অসন্তোষ আর অভিমানের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠবে। কিন্তু এ নিমন্ত্রণ স্বীকার করলে নিজেকে অপমান করা হতো। এই পরিবারকে অপমান করা হত। আত্ম-অবমাননা করা হতো। শ্বশুরমশায়কে পরে বুঝিয়ে বললেই হবে।

পূজো এগিয়ে আসছে।

আর এক মাসও বাকী নেই।

শীলার সঙ্গে উনার অন্তরঙ্গতা আরো বেড়েছে। শীলা এবাড়ির অনেক কথাই জানে। কিন্তু বলতে চায় না। সেদিন সন্ধ্যায়

উনা তিনতলায় নিজের ঘরে বসে আছে। শীলা ঢুকলো এক গেলাস হরলিক্স নিয়ে। কয়েকদিন থেকে একটা কথা উনার মনে জেগেছে, তার জবাব একমাত্র দিতে পারে শীলা। কিন্তু উনা লক্ষ্য করেছে এবাড়ির চাকরবাকরের কাছ থেকে কথা আদায় করা খুব শক্ত। কিছুটা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যায় আর হাজার চেষ্টা করেও বাকীটা শোনা যায় না। আজ যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। শীলা ঘরে ঢোকামাত্র উনা ডাকলো—শীলা!

—কী বৌরানী?

—পরশু যে বললি কোথায় যাবি দু'দিনের ছুটি নিয়ে?

—তারাপুরে বৌরানী।

—তারাপুরে কী?

—সেখানে আমার ছোটবোন আছে। তার একটি বাচ্চা হয়েছে, তাকে দেখতে।

একটু থেমে উনা উঠে গিয়ে একখানা দামী শাড়ি হাতে করে নিয়ে এসে বললো—কুটুমবাড়ি যাবি—যা-তা পরে যাসনে। এইটে পরে যাস। এই বলে শাড়িটা শীলাকে দিল।

হকচকিয়ে গিয়েছিল শীলা প্রথমটায়। তারপর যখন বুঝলো যে সত্যি সত্যিই শাড়িটা দিয়ে দিল বৌরানী, তখন সে আনন্দে কেঁদে ফেললো। বললো—বৌরানী, আপনি মানুষ নন—দেবী। এমন মন আমি আর কোথাও দেখিনি। মা কালী আপনার ভাল করুন।

তারপর বেরোলো এক এক করে সব কথা। উপকারের পথ বেয়ে উপকৃতের যত মনের কথা ছিল সব হুড়হুড় করে বেরিয়ে এলো। উনা শুনলো কোন কারণে যদি চন্দ্রচূড় অপুত্রক দেহত্যাগ করে, তবে এই সম্পত্তি পাবে অনুসূয়ার ছেলে মোহন। স্বামী মারা যাবার পর অনুসূয়া শ্বশুরের সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়ে

পাঁচবছরের ছেলে মোহনের হাত ধরে বাপের বাড়িতে চলে আসে। তারপর চাঁদ ও মোহন একই সঙ্গে মানুষ হতে থাকে।

—আচ্ছা শীলা! বললো উনা—আমার স্বামী যদি অপুত্রক মারা যান, এবং ভগবান না করুন মোহনও যদি মারা যায়, তাহলে? তাহলে এই সম্পত্তি কে পাবে শুনেছিস কিছু?

—হ্যাঁ বৌরানী। এ সবই আমি শুনেছি—একদিন কর্তাবাবা আর গোকুল চক্কোত্তি মশায় আলাপ করছিলেন—আমি কর্তাবাবার পায়ে তেল মালিশ করছিলাম, তাই শুনে ফেলেছি।

—এদের পরে কে পাবে—শুনেছিস?

—হ্যাঁ, শুনেছি তাহলে তারাপুরের সুরঞ্জন রাজা পাবেন এই সম্পত্তি।

চুপ করে শুনে গেল উনা। খবর আরো ছিল। শোনা গেল গোকুল চক্রবর্তীর একটি পরমাসুন্দরী ভাগ্নী আছে। তার নাম মহালক্ষ্মী। তার সঙ্গে মোহনের খুব ভাব।

—দেখিনি তো?

—না। সে এদিকে খুব কম আসে। মোহনবাবু রোজ বিকেলে ওবাড়িতে যান। রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে চলে আসেন।

শীলা চলে যাবার পর ভাবতে লাগলো উনা। জটিল জাল। এ জাল ভেদ করা উনার কাজ নয়। এ যেন আদ্যিকালের এক বিরাট মাকড়শা—বাড়িময় একটা বিরাট জাল পেতে বসেছে তার শিকার ধরবে বলে। হঠাৎ উনার মনে হলো এবাড়ির বাইরেটা যত শান্ত ভেতরটা তত উত্তাল—তত উদ্দাম। একটা নির্লজ্জ কুৎসিত লোভ যেন ভদ্র পোশাক পরে এবাড়ির মধ্যে মানুষের বেশে ভদ্র বেশে চলাফেরা করছে—তাকে আলাদা করে চিনে নেবার উপায় নেই।

সন্ধ্যের মুখে ত্র্যম্বক এসে ডাকলেন উনাকে। ডেকে নিয়ে গেলেন ওপরে তাঁর ঘরে। অনেক কথা বললেন। কিন্তু সব

কথাই কেমন যেন ছাড়া ছাড়া অসংলগ্ন। তার থেকে মোদ্দা একটা কথা বুঝতে পারলো উনা।—বিপদ আসছে—সাবধান হও।

—কী বিপদ ? উনা প্রশ্ন করলো।

—ভীষণ বিপদ। নখদর্পণ কখনো মিথ্যে কথা বলে না। ভাল করে চারদিকে চোখ রেখে পথ চলবে মা। এখন যেন আমার মনে হচ্ছে ভাগ্যের শিকার তুমি।

—আমি ?

—হ্যাঁ মা তুমি। পাগল ত্রাম্বক বলে চলেন।—কখন যে কোন্ দিক দিয়ে বিপদ আসবে কেউ জানে না। তোমার শুদ্ধ সত্তা। তাই এত কথা বলছি। আমার মেয়েকে এসব কথা বলি না। বুকের ভেতরটা ভারী নোংরা ওদের। কথা দাও—সাবধানে থাকবে।

—থাকবো কাকু। ক্লান্ত গলায় উত্তর দিল উনা।

সত্যিই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল আর বুঝি সে পারবে না। কোথাও যেন একটা পরাজয় তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে—তাকে বরণ করতেই হবে এই যেন তার নিয়তি।

পরদিন সকালে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে শ্বশুরের উত্তেজিত গলায় আওয়াজ শুনতে পেল উনা। তিনি বলছেন—ওরে কে আছিস, বৌরানীকে খবর দে।

নীচে নেমে এসে দেখলো, বৃদ্ধ অম্বিকাপ্রসাদের কাছে সুরঞ্জন বসে আছে। উনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। শ্বশুর বললেন—মা, ভুবনদিদি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, তুমি শাড়িটা পালটে তৈরী হয়ে নিয়ে ওর সঙ্গে যাও। ওহো! তোমাদের আলাপ করিয়ে দিইনি। এ হলো সুরঞ্জন। ভুবনদিদির মেয়ের ছেলে। ওই একটিই সন্তান ভুবনদিদির। তারই ছেলে সু। অবিশ্যি ছেলে খুব ভাল। কোন তুলনা হয় না। শুধু একটু গোঁয়ার, একটু বদরাগী, আর একটু বেশী জমিদার।

—দাদু, এগুলো কী ইনট্রোডাকশন হচ্ছে? না না, তুমি কিন্তু এসব কথার একবর্ণও বিশ্বাস ক'রো না বৌরানী। একটু বেশী বেশী বলা হয়ে গেছে। তুমি তৈরী হয়ে নাও। তোমার চিঠি পেয়ে দিদু চটে আগুন হয়ে গেছে।

—তাহলে সেই আগুনে পুড়ে মরার জন্য তারাপুরে না যাওয়াই তো উচিত আমার।

—না না। ওটা কথার কথা বললাম। চলো।

তৈরী হতে বেশী সময় লাগলো না। আধঘণ্টার মধ্যেই তৈরী হয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করে অনুসূয়াকে বলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো উনা। যে গাড়িটি নিতে এসেছিল, তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় গৃহকর্তার পূর্ণদৃষ্টি আছে এসব জিনিসের ওপর। ওরা যেতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

—গাড়িটার কন্‌ডিশান তো বেশ ভালই আছে মনে হচ্ছে।

—ওরে বাপরে! এ হচ্ছে দিদুর পার্সোন্যাল গাড়ি। অর্ডারই আছে—আমি চড়ি অথবা না চড়ি গাড়ি সব সময় চকচক করবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারাপুরের এদিকটায় উনা আসেনি। ভারী সুন্দর দেখতে। দিগন্তবিস্তৃত গেরুয়া প্রান্তর। তারই মধ্য দিয়ে চৌধুরী বাড়ির গম্বুজ দূরে দেখা যায়। পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারাপুর থেকে কালীপুর আসার পাকা সড়কের দু'ধারে গাছ। বোঝা যায় চার পাঁচ বছর লাগানো হয়েছে। গাছগুলো বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

—চিঠি পেয়ে দিদু কী বললে?

সুরঞ্জন উনার দিকে চেয়ে হাসলো। বললো—তোমার জবাবের কী এফেক্ট হবে তা তুমি নিশ্চয় জানতে। কিন্তু বৃদ্ধা সিংহিনীকে ক্ষেপিয়ে কোন লাভ আছে কি?

সুরঞ্জনের আন্তরিকতায় উনার মন প্রসন্ন হলো। বললো—হঠাৎ এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল চিঠিটা পেয়ে।—

—দিহু সম্বন্ধে একটা কথা আগে থেকে বলে রাখি। মানুষটা অতিশয় দাম্ভিকা, অত্যন্ত গর্বিতা—কৌলীন্যবিলাসীনি রায় বাড়ির মেয়ে। তেরো বছরে বিয়ে হয়ে তারাপুরে আসেন। একটি কন্যার জন্মের পর স্বামী একদিন শিকারে গিয়ে মারা যান। একটা ম্যানইটারকে মারেন, মরেনও তার থাবায়! কিন্তু লোকে বলে তাঁকে জঙ্গলের মধ্যে হত্যা করেছিল।

—কেন?

—কারণ অজ্ঞাত। অবিশ্যি দিহু একথা বিশ্বাস করেননি।

—করেননি?

—না না। সে জাতই নয়। তাইতো তোমায় বলছি, এই ভুবনেশ্বরী দেবীর বাইরেটা একরকম ভেতরটা একরকম। বাইরেটা যেন এই বীরভূমের প্রান্তর—শুষ্ক, রুক্ষ, গেরুয়া, কিন্তু ভেতরটা বাংলার শ্যামলিমায় ভরা।

—কবিতাও আসে বুঝি?

—আসতো একসময়। কলেজে পড়ার সময়।

আবার চুপচাপ। অনেকক্ষণ পরে কথা কইলো উনা।

—যদি কিছু মনে না করেন, তবে আর একটা কথা জিগ্যেস করি।

—করো। কিছু মনে করবো না।

—গোকুল চক্রবর্তীকে জানেন আপনি?

—হ্যাঁ। কেন?

—কেমন মানুষ তিনি?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো সুরঞ্জন। উনার মনে হলো প্রশ্নটার বোধহয় জবাব দেবে না সে। কিন্তু জবাব দিল সুরঞ্জন। বললো—লোকটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। কোনদিন কোন মানুষের ভাল দেখতে পারে না। ওই সব মানুষের সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই মঙ্গল।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ।

আর সুযোগ পাওয়া গেল না। বাড়ি এসে পড়লো। উনাকে সঙ্গে নিয়ে সুরঞ্জন দোতলায় উঠে গেল। যেতে যেতে উনা লক্ষ্য করলো সুরঞ্জনের প্রাসাদ তাদের বাড়িটার চাইতে হয়ত ছোট। কিন্তু কী সুন্দর সাজানো। চারদিক একেবারে তকতক করছে। চাকরগুলো পোশাক পরা দাঁড়িয়ে আছে—বুকে মনোগ্রাম। দেখেই মনে হয় ভদ্র এবং সহবত-জানা।

দোতলায় উঠে কয়েকটা ঘর পেরিয়ে দক্ষিণ দিকের একটি মাঝারি সাইজের চমৎকার সাজানো ঘরে তাকে নিয়ে এলো সুরঞ্জন। এইটেই ভুবনেশ্বরীর বসবার ঘর। পাশের ঘরটি তাঁর শোবার। সুরঞ্জন বললো—বোসো। দিদু এখনি বেরোবেন। আমি ঘণ্টাখানেক পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। যদি দিদুর হুকুম হয়।

সুরঞ্জন চলে যেতেই উনা ঘরটির চারদিকে চেয়ে দেখলো। দুটি বড় বড় অয়েলপেটিং দেয়ালে। একটি ভুবনেশ্বরীর স্বামীর, আর একটি বোধকরি জামাইয়ের। সুন্দর চেহারা দুজনেরই। তার মধ্যে একজনের চেহারা দেখতে অবিকল সুরঞ্জনের মত। তাতেই বোঝা গেল তিনি সুরঞ্জনের বাবা। ঘরে যেমনটি থাকা উচিত সেইভাবে সাজানো ঘরটি।

সামনের দরজার পর্দা ঠেলে একটি অপরিসীম সুন্দরী প্রৌঢ়া গম্ভীরভাবে সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে চুপ করে চেয়ে রইলেন উনার দিকে। অনেকক্ষণ পরে ভুবনেশ্বরী কথা কইলেন।

উনা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেনি। হাত তুলে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে ছিল। উনার এই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভুবনেশ্বীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ একটি হাসির রেখা ফুটে উঠলো ঠোঁটের কোণে। বললেন—বোসো তুমি। বোসো।

উনা বসলো।

—আপনি বসুন! উনা বললো।

—তুমি অতিথি। তোমাকে আগে বসতে হয়।

উনা এইবার বসলো। ভুবনেশ্বরী এগিয়ে এসে আর একটি আসনে বসলেন। বললেন—ওভাবে চিঠির জবাব দিয়েছ কেন?

—আপনিই বা ওভাবে নিমন্ত্রণ করেছিলেন কেন?

—আমি সম্পর্কে তোমার গুরুজন। আমি ওভাবে তোমাকে লিখতে পারি।

—তাহলে স্নেহাস্পদেরও অধিকার আছে-ওভাবে জবাব দেবার।

ভুবনেশ্বরীর হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলো। তিনি অকস্মাৎ খুশী হয়ে উঠলেন। বোধ করি বুঝলেন এ মেয়ে শক্তিতে ও চরিত্রে তাঁর সমান সমান। এর সঙ্গে প্রাণ খুলে বোধহয় কথা কওয়া যায়।

—কী খাবে বলো? ভুবনেশ্বরী জিগ্যেস করলেন।

—আপনি যা দেবেন। বললো উনা।

—তবু তোমার কী ইচ্ছে?

হাসলো উনা। বললো—নিমন্ত্রিত হয়ে এসে যদি খাবারের নাম বলতে হয় তাহলে হ্যাংলা মনে হবে আমাকে। তার চাইতে আপনি বলুন। যা বলবেন, তাই খাব।

—যা বলবো তাই খাবে?

—হ্যাঁ।

গম্ভীর হয়ে গেলেন ভুবনেশ্বরী। বললেন—যদি বলি একটু বিষ খাও!

—কেন?

—যদি বলি তুমি রায় বাড়ির চাঁদকে ঠকিয়ে—তাকে ভুলিয়ে তার সম্পত্তির লোভে তাকে বিয়ে করেছ, তোমার বাঁচার কোন অধিকার নেই। তাহলে কী বলবে তুমি?

ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠলো উনা। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ হতে না দিয়ে যথাসম্ভব শান্তগলায় বললো—তাহলে আমি বলবো এত বয়স পর্যন্ত মানুষ চেনার আপনি কোন সুযোগ পাননি।

এতদিন তাদের ঠকিয়ে তাদের ওপর আধিপত্য করছেন আপনি। বিষ খাওয়া উচিত আপনার।

স্থির চোখে চেয়ে আছেন উনার দিকে ভুবনেশ্বরী। উনা প্রশংসা করলো মনে মনে ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্বের। এই পঁচাশি বৎসর বয়সেও তিনি সোজা হয়ে চলেন এবং যৌবনকালের অতুলনীয় রূপ এখনো যেন দেহের সব জায়গা ছেড়ে যায়নি। রানী হবার উপযুক্ত চেহারাই বটে ভুবনেশ্বরীর।

তিনি চেয়ে আছেন দেখে গলায় জোর দিয়ে উনা বললো—চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, পনেরো দিন পরে যখন আমার কাছে সে বিয়ের প্রস্তাব করে, তখনো আমি জানি না সে জমিদার। তখনো আমি জানি না কালীপুরে তার জমিজমা আছে। আমার নিজের সম্পত্তি কিছু কম নেই। আমার বাবাও জমিদার। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। অন্য লোকের সম্পত্তির লোভে তাকে বিয়ে করাকে আমি ঘৃণা করি, এবং দরকার হলে এই জমিদারি আমি পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারি।

এতক্ষণ পরে হেসে উঠলেন ভুবনেশ্বরী। বয়স হলে কী হবে এখনো অপূর্ব মোহময়ী হাসি হাসতে পারেন তিনি। চেয়ার থেকে উঠে এসে উনাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। হাসতে হাসতে বললেন—রায়েদের সঙ্গে চৌধুরীদের চিরকালের শত্রুতা। পরীক্ষা করে দেখলাম শত্রু হিসেবে তুমি কেমন হবে।

—কী বুঝলেন? বললো উনা।

—বুঝলাম তুমি ভয়ংকর শত্রু হতে পারবে। সেই জন্যেই তো ডেকে আনিয়েছি। আগে থেকে ভালবেসে তোমার বিষদাঁত ভেঙে দেব আমি।

—তাই বুঝি?

—ঠিক তাই। এসো, আমার শোবার ঘরে এসো। এখন থেকে আমরা বন্ধু। তবে একটা কথা তোমাকে বলি উনা, ভয়া-

নক শত্রুপুরীতে পা দিয়েছ তুমি। জানি না কপালে কী আছে তোমার। কতকগুলো বিষয়ে আমি তোমাকে সাবধান করে দেব। এসো।

সারাদিন থেকে সন্ধ্যের আগে নাতিকে ডেকে পাঠালেন ভুবনেশ্বরী। সঙ্গে সঙ্গে সুরঞ্জন এসে হাজির হলো।

—বৌমাকে তুমি নিজে পৌঁছে দিয়ে এসো।

—আচ্ছা। এই বলে সুরঞ্জন বেরিয়ে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো। বললো—চলো।

এইবার দেখা গেল উনা ভূমিষ্ঠ হয়ে ভুবনেশ্বরীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলো। ভুবনেশ্বরী তাকে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন—যা বলে দিলাম মনে থাকে যেন। অম্বিকা তোমাকে সত্যি স্নেহ করে—সেটা আমি সেখানে না গিয়েও বুঝতে পারি। কিন্তু আর যারা আছে সেখানে—তাদের সঙ্গে অভদ্রতা করবে না, মেলামেশা করবে কিন্তু বিশ্বাস করবে না। আর তুমি যে বিশ্বাস করছো না সেটা তাদের বুঝতে দেবে না। যখন যে অসুবিধে হবে, সর্বদা মনে রেখো তোমার আধ মাইলের মধ্যে আমি আছি, সুরো আছে, নির্ভয়ে চলে এসো।

মাথা নীচু করে বললো উনা—তাই হবে পিসীমা।

—যাও। স্বামীসোহাগিনী হও।

সুরঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উনা যখন গাড়িতে উঠলো, তখন তার মনে হলো অত্যন্ত প্রিয়জনের কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। এখানে এই বরাভয়া বৃদ্ধার কাছে থাকতে পারলেই যেন ভাল হতো।

গাড়ির মধ্যে সুরঞ্জন বললো—কেমন লাগলো দিদুকে ?

—অপূর্ব ! অনুতাপ হচ্ছে—কেন আগে আসিনি !

—সময় না হলে কিছুই হয় না।

—তা বটে।

উনা অবাক হলো সুরঞ্জনের বাক্‌সংযমে।—প্রয়োজন না হলে সে কথা কয় না। একটুও বেশী কথা বলে না, ঠিক যেটুকু দরকার সেইটুকু। তার বেশী একটা কথাও না।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে রায়মঞ্জিলে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে সুরঞ্জন দরজা খুলে দিল। উনা নেমে ছোট্ট করে বললো—ধন্যবাদ। তারপর সোজা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

অম্বিকার ঘরের সামনে অনুসূয়া দাঁড়িয়ে ছিল। উনাকে দেখে বললো—বাপ রে—পিসীমার ওখানে অনেকক্ষণ কাটিয়ে এলে তো! আমি তো মনে করলাম আজ রাত্রে হয়তো তোমাকে আসতে দেবে না।

—প্রথম দেখা তো!

—কী বললেন?

—এই, আমার কে আছেন না আছেন। ভাই বোন আছে কিনা, কতদূর লেখাপড়া করেছি—এই সব।

—আর কিছু না?

—না।

শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য উনা দু'পা এগোতেই অনুসূয়া বললো—এখন যেও না। জেঠুর শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে। গোকুলকাকা এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। এখন ঘুমোচ্ছেন। বেলা দুটো তিনটে নাগাদ তোমার খোঁজ করছিলেন। বললাম—এখনো আসেনি।

—অসুখটা কী?

—বুকের বাঁ দিকে একটা ব্যথা মতো হয়। বেশীক্ষণ যুঝতে পারেন না, অজ্ঞান হয়ে যান।

—এ কি মাঝে মাঝেই হয়?

—মাঝে মাঝেই হয়। গোকুলকাকা এসে ওষুধপত্র দেন। আবার কমে যায়। এবার দেখছি এক মাসের মধ্যে দুবার হ'লো।

উনা আর নীচে অপেক্ষা করলো না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ঘরে ঢুকে দরজা খুলে গোল বারান্দায় বেরিয়ে দেখলো দূরে প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে সুরঞ্জনের গাড়ি চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। উনার মনে হ'লো—ওই যে বাড়ি থেকে একটু আগে বেরিয়ে এসেছে, ওই যে যুবকটি নেমে সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে তাকে নামতে সাহায্য করলো, ওরাই যেন উনার আপন জন। এ বাড়িটা যেন পরের। ওই যে সিংহিনী, মুখের রেখায় রেখায় যার এই পঁচাশি বছর বয়সেও আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের ছাপ, যার সঙ্গে কথা কয়ে কথা কওয়ার আশ মেটে না, তাঁর কথা মনে পড়ে কোথায় যেন একটু অভাব অনুভব করলো উনা। "দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।" মনে পড়লো উনার।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো—কতদিন সে গান গায় নি। ক—তো দিন। একটা ডিভানে বসে ভাবতে চেষ্টা করলো শেষ কবে গান গেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান। ছুটির আগে কলেজের সোস্যালে সে গান গেয়েছিল। তারপরই বাড়ি। তারপর বিয়ে। তার শোবার ঘরের একপাশে একটা টেবিল অর্গ্যান আছে। গাইবে একদিন। বরং পূজোর চারদিন যখন সবাই থাকবে, বাড়ি ভরা থাকবে আত্মীয়স্বজনে, সে সময় গাইবে সে।

ক্লান্তি···অপরিসীম ক্লান্তি চেপে ধরছে সমস্ত দেহকে। বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লো উনা। ঘুম ভাঙলো চন্দ্রচূড়ের ডাকে।

—উনা! উনা! আরে, তুমি ডিভানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছ! ওঠো ওঠো—খাবে না? তোমাকে ঘুমুতে দেখে আমি শীলাকে তোমার আমার খাবার দিতে বলে এসেছি। এক্ষুণি নিয়ে আসবে। ওঠো।

উঠে পড়লো উনা।

রাত্রে চন্দ্রচূড় বললো—পুজোর কাপড়চোপড় ও আর সব জিনিসপত্র কিনতে এখান থেকে টাকা নিয়ে সরকার মশায় যাবেন। তোমার কী কী লাগবে একটা লিস্ট করে দিয়ো কাল সকালে।

—সরকার মশায় পছন্দ করে কেনেন বুঝি?

—না। পছন্দটা যার জিনিস তার। উনি দোকানে নিয়ে গিয়ে ফর্দটা দেন। তারাই সব পছন্দ করে লেটেস্ট ডিজাইনের জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেয়। তোমার শাড়ী ব্লাউজ আর কস্‌-মেটিক্‌স্‌ কী কী লাগবে লিখে দিও। উনি বেলা এগারোটার সময় আসবেন।

উনা হাসলো। বললো—কোথায় যাব ওসব পরে?

চন্দ্রচূড়ও হাসলো। বললো—তা বটে। কালীপুরটা যেন পাণ্ডব-বর্জিত রাজ্য। কিছুই নেই এখানে। খালি খাও দাও তাস পাশা খেলো—নয়তো নেশা-ভাং করো। আমি পরশু বাবাকে বলেছি, আমরা কোলকাতায় থাকবো! বাবাও দেখলাম খুব অমত করলেন না। বললেন—আমিও ভাবছিলাম তোকে একথা বলবো। আমার মনে হয় বৌমার মন এখানে টিকছে না।

—বৌমার মন টিকছে না? বললো উনা।—বাঃ! বেশ তো তুমি! একটা প্রতিবাদ করলে না?

—কিসের প্রতিবাদ? অবাক হয়ে বললো চন্দ্রচূড়।

—তোমার বলা উচিত ছিল তোমার মন টিকছে না।

—সেটা বাবা বুঝেছেন। তাই বললেন—বাড়িটার অ্যাটমস্‌-ফিয়ার তো গ্লুমি। তার ওপর বৌমার কথা কওয়ার কোন লোক নেই, কোন সঙ্গী নেই। ঠিক আছে। সামনে পুজো। লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরদিন তোমরা চলে যাও।

—আমরা চলে গেলে বাবার কষ্ট হবে না? বললো উনা।

—বাবার জীবন তো জান না। সারাটা জীবন উনি একা একা কাটিয়েছেন। কষ্ট হবে বৈকি। নিশ্চয় কষ্ট হবে। তবে

উনি প্রকাশ করবেন না। ভয়ানক চাপা মানুষ তো! পিসীমাকে দেখে এলে?

—হ্যাঁ।

—কী রকম মনে হ'লো?

—অদ্ভুত! আশ্চর্য মেয়ে।

—ওই সুরঞ্জনের মাকে কোলে নিয়ে উনি বিধবা হন। তারপর একা ওই মেয়েকে মানুষ করেন, জমিদারি শাসন করেন। ভাবতে পারো একটি মেয়ের পক্ষে এ কাজ কত শক্ত?

—ওঁর পক্ষে নয়।

—তা বটে।

—মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরজামাই রেখেছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ। সেও খুব পণ্ডিত লোক ছিল। সুরঞ্জন নিজেও এম-এ।

—এম-এ!

—হ্যাঁ। ওর দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা। তারাপুর গ্রামটা তুমি নিশ্চয় ঘুরে ভাখোনি?

—না।

—দেখলে দেখতে পেতে এমন সাজানো গ্রাম চট্ করে চোখে পড়ে না। ক্লাব আছে, প্রকাণ্ড লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরীর মধ্যে একটা স্টেজ আছে। মাঝে মাঝে সেখানে ছেলেরা থিয়েটার করে। সপ্তাহে দু'দিন সিনেমা দেখানো হয়—সবই স্টেটের খরচায়।

—বা-রে! আমাদের চাইতে কি ওদের জমিদারি বড়?

—আগে ছিল না। এখন সুরঞ্জন অনেক বাড়িয়ে ফেলেছে। তাছাড়া আরো মজা কি জান? ওর জমিদারির লোক কখনও কোর্টে যায় না। বিচার করেন পিসীমা। যা বিচার করে দেন, তাই মেনে নেয় প্রজারা।

—রামরাজ্য বলো !

—হ্যাঁ, পিসীমার জমিদারি রামরাজ্যই বটে

দেখতে দেখতে দিন এগিয়ে এলো। চারপাশের গ্রাম থেকে বোধনের ঢাক বেজে উঠলো। দলে দলে প্রজারা এসে জমিদারকে দর্শন করে প্রণামী দিয়ে যেতে লাগলো। এইটেই নাকি এ বংশের নিয়ম। দুর্গাপূজোর বোধনের দিন প্রজাদের জমিদারকে দর্শন করতে হয়। অনেকে এসে তাদের নতুন বউরানীকে দেখে গেল। কেউ কেউ টাকা—কেউ কেউ গয়না দিয়ে গেল।

মহাষষ্ঠীর দিন সুরঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে ভুবনেশ্বরী এলেন। যেদিন উনাকে তিনি প্রথম বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ত্থাখেন, সেদিন একজোড়া সোনার বালা দিয়েছিলেন। আজ আবার এসে উনাকে একটি নেকলেস দিয়ে আদর করলেন—আশীর্বাদ করলেন। সিউড়ির দিকে থাকেন উনার এক মামাশ্বশুর অবিনাশবাবু। তিনিও বৃদ্ধ। তিনিও সপরিবারে এসেছেন। মামীশাশুড়ীও গয়না দিয়ে ভাগ্নে-বৌয়ের মুখ দেখলেন। আরো অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছেন। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু দিয়ে মুখ দেখলেন উনার। সকলেই অনুযোগ করলেন বিয়েতে না বলার জন্য।

অম্বিকা বললেন—তা আমি কী করবো বলো? চাঁদ বিয়ে করে একেবারে মধুযামিনী-টামিনী সেরে বাড়ি ফিরলো। তখন আর নতুন করে বৌভাত করা সম্ভব নয়। ভেবে রেখেছিলাম পূজোর সময় সবাই এক জায়গায় হ'লে উৎসবটা করা যাবে।

যদিও ঘটে পূজো, তাহলেও অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। গোকুল চক্রবর্তী পূজো করছেন। বাড়ির ভিতর মহলে নাটমন্দির। সেখান থেকে প্রণাম করে উনা হলে এসে দেখলো, সুরঞ্জন একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মেয়েটির বয়স হবে বছর

আঠারো উনিশ। কিন্তু এককথায় যাকে বসে নিখুঁত সুন্দরী। রূপের যেন আর সীমাপরিসীমা নেই। একটি হালকা রংয়ের বেনারসী পরে মেয়েটি যেন জ্বলছে।

পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল উনা, সুরঞ্জন ডাকলো—এই যে নতুন মামী, এগিয়ে এসো আলাপ করে দিই। ইনি হলেন আমার নতুন মামী—উনা রায়। আর এ হ'লো আমাদের পুরো-হিত কাম্ কবিরাজ গোকুল চক্রবর্তী মশায়ের ভাগ্নী মহালক্ষ্মী।

দুজনেই হাত তুলে নমস্কার করলো। মহালক্ষ্মী হেসে বললো—অদ্ভুত নাম আপনার। উনা। শুনিনি কখনো।

—আপনার মহালক্ষ্মী নামটা খুব সার্থক। মহালক্ষ্মীই বটে। আচ্ছা, আছেন তো এখন ?

—হ্যাঁ।

—দেখা হবে। তখন আরো আলাপ হবে।

—ইনি আলাপে খুব পটু নন। বললো সুরঞ্জন।

—সে কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে রাজী নই। বলে উনা হেসে চলে গেল।

শ্বশুরের ঘরের দিকে যেতে যেতে উনা ভাবলো, অবিবাহিত সুরঞ্জন কি তাহলে মহালক্ষ্মীকে বিয়ে করবে ? দুজনের কথা বলার ভঙ্গী থেকে বোঝা যাচ্ছিল আলাপটা অনেকদিনের। যাই হোক, মেয়েটি অসম্ভব সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরী হলেই তো হবে না, তাকে ভুবনেশ্বরীর পছন্দ হওয়া চাই। নইলে নাতির বিয়ে তিনি কিছুতেই দেবেন না। আর ভুবনেশ্বরীর যে কী পছন্দ বা কাকে পছন্দ সে কথা তাঁর সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে বোধনের রাত্রি প্রায় বারোটা হলো। বাড়ির অনেকগুলো ঘর খোলা হয়েছে। প্রত্যেক ঘরে আলাদা আলাদা ফ্যামিলির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। রায়পরিবারের নিয়ম হচ্ছে পূজোয় যাঁরা আসবেন তাঁরা একাদশীর দিন যাবেন। এই

ক'দিন থাকতে হবে। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, মেলামেশার মধ্যে এই বহু পুরাতন প্রাসাদের প্রতিটি ঘর চারটে দিন কলমুখরিত হয়ে ওঠে।

রাত্রে আবার দেখা হলো মহালক্ষ্মীর সঙ্গে উনার। তখন সে মোহনের সঙ্গে চুপ করে বারান্দায় বসেছিল। মোহন উঠে পরিচয় করে দেবার চেষ্টা করতেই, মহালক্ষ্মী বললো—অনর্থক ব্যস্ত হয়ো না, ওটা হয়ে গেছে।

—কে আলাপ করিয়ে দিল? মোহন প্রশ্ন করলো।

—তারাপুরের মালিক।

—আচ্ছা, তাহলে তো ভালই। খুবই ভাল।

হঠাৎ উনার মনে হলো মোহন সুরঞ্জনকে পছন্দ করে না। সামান্য একটা কথা বলার মধ্যেই একটু যেন বিদ্বেষ, একটু যেন রাগ প্রকাশ পেলো। পাঁচ মিনিট বসে ওদের সঙ্গে ভদ্রতা বিনিময় করে উঠে পড়লো উনা। ওপরে উঠতে পারবেন না বলে নীচের তলার একটি বড় ঘরে সুরঞ্জন ও ভুবনেশ্বরীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। শুতে যাবার আগে উনা সেই ঘরে ঢুকলো।

গিয়ে একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখলো সে। ভুবনেশ্বরী ও ত্র্যম্বক কথা বলছেন। ত্র্যম্বক বলছেন—তুমি বুঝতে পারছো না দিদি। মাতৃবীজ লক্ষবার জপ করলে সিদ্ধিলাভ হয়।

—সে সিদ্ধির নাম ভাং। ভুবনেশ্বরী গম্ভীর হয়ে বললেন।

—না না, ভাং নয়—ভাং নয়। সিদ্ধি। এটা পেলে কি হয় জান? নখদর্পণে ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া যায়। পরিষ্কার দেখা যায়। আমি দেখেছি যে!

—কী দেখেছিস?

—বাঃ! সূর্য যখন গোল বারান্দা থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেল। আমি ওকে বারণ করেছিলাম।

—কাকে বারণ করেছিলি? তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন ভুবনেশ্বরী।

—বাঃ! সূর্যকে।

ভুবনেশ্বরী কিছুক্ষণ চুপ করে ছোটভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—চিরটাকাল তোর একভাবে পাগলামি করেই জীবনটা গেল। সেই ছেলেবেলাতেও যা দেখেছি, মাস্টারের কাছ থেকে পালিয়ে কালীর ঘরে গিয়ে বসে থাকতিস, এখনো এই বুড়োবয়সেও তাই।

হাসলেন ত্র্যম্বক। বললেন—দিদি, তুমি আমার কথা শুনছো না। কিন্তু বিশ্বাস করো আমি আমার রক্তের মধ্যে বিপদের গন্ধ পাই। আমি তোমাকে বলছি এই পূজোর মধ্যেই—

—তুই থাম্, বলে ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন ভুবনেশ্বরী। তারপর উনার দিকে চেয়ে বললেন—কিছু বলবে বৌমা?

—না পিসীমা। আমি এমনি জানতে এসেছিলাম আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা।

—না মা। এটা আমার বাপের বাড়ি। এখানে আমার অসুবিধে হবে কেন? সুরঞ্জনকে দেখেছ?

—না তো!

—আচ্ছা যাও মা। অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়গে যাও।

উনা কোন কথা না বলে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দেখলো, একটা জায়গায় চুপ করে অনুসূয়া দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন উনাকে দেখেও দেখতে পেলো না। চুপ করে জানালার দিক চেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো। উনাও তাকে বিরক্ত করলো না। সোজা তিনতলায় উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

উনার জন্য জেগে বসেছিল চন্দ্রচূড়। বললো—আর তিনটে দিন। তারপরেই আমরা কোলকাতা যাচ্ছি। বাবাকে বলেছি, বালীগঞ্জের দিকে একটা বাড়ি কিনবো আমি। বেশ নিরিবিলি থাকা যাবে ওদিকটায়। পরে বুঝেছ,—ভেবেচিন্তে একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করা যাবে।

—ব্যবসা করবে তুমি? উনা হেসে বললো।

—হাসির কী আছে এতে? ব্যবসা কি মানুষ করে না? সেই রকম ব্যবসাই করবো, যা করতে বেশ ভাল লাগবে। বাঁচা যায় কলকাতায় গেলে। তুমি দেখেছ, আমাদের এই বাড়িটায় কেমন যেন ভয়-ভয় করা পরিবেশ। আমার একদম ভাল লাগে না এখানে থাকতে।

—সত্যি। বললো উনা। —ভারী নিরানন্দ।

—ঠিক তাই। যাক্ বাবা, আর তিনটে দিন। কাল থেকেই তুমি সব গোছগাছ করো। বুঝলে?

—আচ্ছা।

আরো অনেক পরে চন্দ্রচূড় ঘুমিয়ে পড়লে উনা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো, কী কথা বলছিলেন ত্র্যম্বককাকা? পূজোর মধ্যেই কোন বিপদ ঘটবে? কী বিপদ? কেমন বিপদ? কোন্ দিক থেকে আসবে সেই বিপদ? কাকে চোট করবে? যদিও পিসিমা ধমক দিয়ে ত্র্যম্বককাকাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, তবু কথাটা তার কানে গিয়েছিল। বিপদ আসছে। কিন্তু যে বিপদের কোন হাত নেই, পা নেই, যাকে জানা যায় না, চোখে দেখা যায় না, তাকে কী দিয়ে ঠেকাবে উনা।

ভাবতে ভাবতে যখন উনা ঘুমিয়ে পড়লো তখন রাত একটা।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল উনার। চোখ মেললো। কে যেন কাকে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ডাকছে। কানে এলো—বৌরানী! বৌরানী! শীগ্‌গির দরজা খোল। দেওয়াল ঘড়ির দিকে চাইলো উনা। চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকী। ঘুমচোখে স্বামীকে ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখলো চাঁদ নেই পাশে। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিতেই অনুসূয়া ঢুকলো।

—শীগ্‌গির নীচে চলো একবার।

—কেন? কী হয়েছে? কী ব্যাপার? এখনো ভোর—

—গোল বারান্দা থেকে চাঁদ নীচে লাফিয়ে পড়েছে।

—'না' বলে তীব্র চীৎকার করে উঠলো উনা।

—নীচে এসো আমার সঙ্গে। বলে অনুসূয়া উনার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো।

নীচে নেমে গেট দিয়ে বেরিয়ে দেখলো চন্দ্রচূড়ের মৃতদেহের কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। আত্মীয়স্বজন সবাই। উনা কাছে যেতেই ভুবনেশ্বরী তাকে ধরে বললেন—তোমার আর দেখতে হবে না। ঘরে চলো। এই বলে তিনি উনাকে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে এসে বসালেন। উনা বিছানার ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো। উনার মাথার কাছে বসে ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ভুবনেশ্বরী।

মুখাগ্নি উনাকেই করতে হলো। কিছু চেনা যায় না চন্দ্রচূড়ের। মুখ আর মাথাটা থেঁতলে গেছে। সেইদিকে চেয়ে উনা মনে মনে বললো—তুমি কি নিজে করলে এই কাজ? না কেউ করালো তোমাকে দিয়ে জোর করে? খুন? কে খুন করলো তোমাকে? কার স্বার্থ সব চাইতে বেশী তোমার মৃত্যুতে? কে? চিতার আগুনের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো উনা।—কে? মোহন? অনুসূয়া? এই সম্পত্তির লোভ আর কার থাকতে পারে? সুরঞ্জন? চেয়ে দেখলো—ঠিক তার পাশটিতে সুরঞ্জন চুপ করে বসে আছে ওই একইভাবে চিতার আগুনের দিকে চেয়ে।

—কী দেখ্ছো? আস্তে আস্তে বললো সুরঞ্জন।

—ভাবছি এই মৃত্যুতে কার স্বার্থসিদ্ধি হলো?

—চুপ, চুপ! এখন ওসব কথা নয়। একেবারে চুপ।

চুপই করলো উনা। কিন্তু তার মন বলতে লাগলো, এ হতেই পারে না। কখনই হতে পারে না। ঘুমের মধ্যে চলা-ফেরার অভ্যেস তো ওর মোটেই ছিল না। কতোদিন এমন

হয়েছে—সারারাত বিছানায় শুয়ে চাঁদ ঘুমিয়েছে, কতদিন তার মুখের দিকে চেয়ে বসে থেকে গোটা রাত্রি কেটে গেছে উনার। মনে পড়লো ত্র্যম্বকের কথা। বিপদের গন্ধ আমি আমার রক্তের মধ্যেই পাই দিদি। বিপদ আসছে। এই পূজোর মধ্যেই—

খবর পেয়ে নদীতীরের শ্মশানে এক এক করে প্রজারা জড়ো হচ্ছে। সকলেই ফিরে ফিরে চাইছে উনার মুখের দিকে। সকলের সমবেদনা যেন উনার প্রতি। চাঁদ রাজার বৌ। উনার এক পাশে বসে আছে সুরঞ্জন। আর এক পাশে অনুসূয়া। উনা চোখ মেলে দেখতে লাগলো কে কোথায় আছে। মোহন কোথায়? দেখা গেল একটু দূরে সে গোকুল চক্রবর্তীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে। যেন গোকুল বলছে—হ্যাঁ। আর মোহন মাথা নেড়ে 'না' বলছে।

আসেননি ভুবনেশ্বরী। তিনি শোকার্ত ভাইয়ের কাছে আছেন।

দাহ শেষ হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল পঞ্চভূতে চন্দ্রচূড়ের মরদেহ। সেইদিকে চেয়ে উনা বললো—গোছগাছ করতে বলেছিলে। কোলকাতায় যাবে না? একবার ভেবে দেখলে না এবার আমি কোথায় যাব? বাপের বাড়ির সেই নিরানন্দ পুরে? কোলকাতার কলেজ হোস্টেলে? আবার পড়তে শুরু করবো? মুছে ফেলে দেবো তোমার স্মৃতি মন থেকে? কিন্তু তা তো পারবো না। চব্বিশ ঘণ্টাই যে তোমার স্মৃতি, তোমার স্বপ্ন, তোমার কথা আমাকে পীড়া দেবে। তাহলে আমি কী করবো?

শ্মশান থেকে ফেরার পথে সুরঞ্জনই উনাকে ধরে নিজের গাড়িতে তুললো। অনুসূয়া, মোহন প্রভৃতি বাড়ির গাড়িতে উঠলো। প্রায় এক মাইল পথ। বেলা বারোটা বেজে গেছে। ঝক্‌ঝক করছে আশ্বিনের নীল আকাশ। শ্মশানের পথটা দশপীঠের মধ্যে দিয়ে। আসতে আসতে চেয়ে দেখলো উনা, কয়েক শতাব্দী আগেকার সেই ভগ্নস্তূপ রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে। সেই দিকে

চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উনার মনে হলো—সব মিথ্যে, সব ফাঁকি, কোথাও কিছু নেই। অতীতের কোন তান্ত্রিক আজ ভয় দেখাবার জন্যে কায়া পরিগ্রহ করে আসতে পারে না। সব মিথ্যে, সব ফাঁকি···

শ্বশুরের ঘরে গেল উনা। পরনে বিধবার বেশ। হাতের কয়েক গাছি চূড়ি, খুলতে বলেছিল অনুসূয়া, কিন্তু খুলতে দেয়নি সুরঞ্জন। বলেছিল—এই ক'গাছা হাতে থাকলে খুব বড় রকমের পাপ কিছু হবে না। ওগুলো হাতেই থাক। তাই চূড়িগুলো হাতেই আছে।

অম্বিকা পাথরের মূর্তির মতন স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। উনা কাছে যেতেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। একটি কথা নয়। এত শক্ত মানুষ। কিছুক্ষণ পরে ভুবনেশ্বরী উনার হাত ধরে বার করে নিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে বললেন—যাও, নিজের ঘরে যাও। অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর তাঁর মুখ। একেই রাশভারী সুন্দর চেহারা। সে মুখ যেন থমথম করছে।

নিজের ঘরে ঢুকেই গোল বারান্দার দিকে চেয়েই উনার মনে হলো যে এ বাড়িতে আসার তিন চার দিন পরে শ্বশুরকে বলেছিল—বাবা, গোল বারান্দায় বেরোবার দরজাটা মিস্ত্রী ডাকিয়ে গেঁথে দিন। ঘরে তো এমনি অনেকগুলো জানালা আছে—ওই দরজাটার কোন দরকার নেই।

বাধা দিয়েছিল অনুসূয়া। বলেছিল—ঘরটাকে এভাবে নষ্ট করে লাভ কী? খানিকটা আলো হাওয়া তো বন্ধ হবেই। বাড়ির সেরা ঘরগুলোর মধ্যে ওটা একটা। মিছিমিছি নষ্ট করে কী লাভ?

আর কিছু বলেনি উনা। অম্বিকা বলেছিলেন—এখন থাক বৌমা। পরে যদি প্রয়োজন মনে করো গেঁথে দেব।

অনুসূয়া। তার একমাত্র ছেলে মোহন। সেই রাত্রে কোথায়

ছিল মোহন? শেষ তাকে দেখেছে উনা মহালক্ষ্মীর সঙ্গে গল্প করতে। তারপর সে কোথায় গেল?

অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে, চাঁদের মৃত্যুতে নিশ্চয়ই কেউ লাভবান হবে। আত্মহত্যাটা যেন কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না মন। কিছুতেই না। রাত বারোটা পর্যন্ত যে লোক স্ত্রীর সঙ্গে বসে বসে ক্রমাগত তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছে, স্ত্রীকে গোছগাছ করে নিতে বলেছে, সে কি করে রাত তিনটের সময় গোল বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। কী করে সম্ভব? যদি তার মনে আত্মহত্যার ইচ্ছেই থাকবে, তাহলে সে স্ত্রীকে এসব কথা বলতে পারে না।

নাঃ, হেরে গেল। চন্দ্রচূড় বলেছিল—তুমি আমাকে বিয়ে করলে আমি বাঁচবো উনা। আমার এই ভয়-ভয়টা কমে যাবে। সে বাঁচাতে পারলো না তাকে। যদি অত ঘুমিয়ে না পড়তো, তাহলে হয়তো—

শ্রাদ্ধ উনাই করলো। গোকুল চক্রবর্তী মন্ত্র পড়ালেন। পূজায় সমাগত আত্মীয়স্বজন কেউ সপ্তমীর দিন, কেউ মহাষ্টমীর দিন নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেছেন। শোকের এই তীব্রতায় সকলেই স্তম্ভিত, মর্মাহত, মুহ্যমান। শুধু ভুবনেশ্বরীকে দেখা গেল অচল অটল। সুরঞ্জন প্রত্যহ তারাপুরে যেতো ফিরে আসতো। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তাঁর ভাই এবং উনাকে ছেড়ে একপাও কোথাও যাননি।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল—পরদিন তারাপুর থেকে সকালে গাড়ি এলো। উনা ওপরে ছিল, নীচে নেমে গেল। ভুবনেশ্বরীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল অনুসূয়া। মোহনকে আজকাল বাড়িতে দেখাই যায় না। একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় দেরি করে ফিরতে দেখে অনুসূয়া জিগ্যেস করেছিল—সারাটা দিন থাকিস কোথায় তুই?

—বাইরে। জবাব দিয়েছিল মোহন।—কী হবে বাড়িতে থেকে? আমার ভাল লাগে না।

উনাকে আসতে দেখে অনুসূয়া বললো—পিসীমা যাচ্ছেন আজ।

ভুবনেশ্বরী উনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—আমি জানি বৌমা, কী হচ্ছে তোমার মনের মধ্যে। এ দুঃখ আমি তো পেয়েইছি, অনুও পেয়েছে।

উনার চোখে জল আসবার আগে অনুসূয়ার চোখে জল এসে গেল। বললো—সেদিনের কথা ভাবতেও ভয় লাগে পিসীমা। কেন যে চাঁদ আত্মহত্যা করলো—!

—আত্মহত্যা কিছুতেই নয়। ওকে হত্যা করা হয়েছে। ফস্ করে বলে বসলো উনা।

অনুসূয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। সে সোজা উনার দিকে চেয়ে বললো—না না, একথা ঠিক নয়। কেন বৌরানী তুমি একথা বলছো আমি জানি না। কিন্তু ভেবে দেখ—ও বাড়িতে চাঁদকে হত্যা করবে কে? কার গরজ পড়েছে এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে? আর দরকারই বা কী?

ভুবনেশ্বরী বাধা দিয়ে বললেন—তোমার গেছে বৌমা। তোমার মন হয়তো এখন অনেক কথা বলবে। ওসব কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল। যার যায়—তারই যায়। আচ্ছা আমি চলি মা। যাই রে অনু!

—এসো পিসীমা! বললো অনুসূয়া।

—এর মধ্যে আমার কাছে এসে কয়েকটা দিন থেকে যেও বৌমা। আমি অম্বিকেকে বলে এসেছি। চল্ সুরো!

একটা মজা লক্ষ্য করলো উনা। যতক্ষণ এসব কথা হচ্ছিল, দিদিমার পাশে সুরঞ্জন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। একটা কথাও বলেনি। এইবার উনার দিকে চেয়ে বললো—চলি। কবে আসবে চাকরকে দিয়ে খবর পঠিয়ে দিয়ো। আমি এসে নিয়ে যাব।

দু'জনে গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

ফাঁকা···আরো ফাঁকা হয়ে গেল বাড়িটা। ভুবনেশ্বরী যেন ভরিয়ে রেখেছিলেন বাড়িটাকে তাঁর অভয় উপস্থিতি দিয়ে। সেদিন সমস্তটা দিন অসহ্য একাকীত্ব নিয়ে কাটালো উনা। বেলা তিনটে নাগাদ বেরিয়ে গেল দশপীঠের রাস্তার দিকে। বেশ খানিকটা ঘুরে এলো একা একা। আর কোন তান্ত্রিকই তাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

পথ দিয়ে আসতে আসতে তার মনে হলো লাভ কী এখানে থেকে? বেশীদিন এভাবে একা একা কাটালে সে তো পাগল হয়ে যাবে। সে বাড়ি ফিরে সোজা অম্বিকার ঘরে গেল। অম্বিকা বিছানায় বসে গীতা পড়ছিলেন। গুরুগম্ভীর অথচ শান্ত গলার আওয়াজ। ঘরের মধ্যে মৃদুমন্দ ধ্বনিত হচ্ছে সে শব্দ। উনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে থামলেন।

—কী মা-মণি ?

—বাবা, আমি ভাবছি কিছুদিন মধুপুরে গিয়ে থেকে আসি।

—বেশ তো মা! বাপের বাড়ি যাবে এতে আমার মত নেবার কিছু নেই। কাল সকালেই তুমি বেয়াই মশায়কে চিঠি লিখে দাও। কালকে সকালেই আমি পঞ্জিকা দেখে দিন ঠিক করে দেব। একেবারে দিনটা পর্যন্ত বরং উল্লেখ করে দিও। সরকার তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমাকে বাপের কাছে পেঁৗছে দিয়ে আসবে।

অপূর্ব মানুষ। যেমন ভাই, তেমনি বোন। দুজনের মুখেই শোক দুঃখ যেন কোন রেখা ফেলে না। ধীর স্থির, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। ভেতরে কী হচ্ছে বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

রাত্রে শুয়ে বাপের কাছে চিঠি লিখলো উনা। শুধু তারিখের জায়গাটা খালি রেখে দিল।

মধুপুর রওনা হবার আগের দিন তারাপুরে গেল উনা।

সমস্ত দিন কাটালো সুরঞ্জন আর ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে। ভুবনেশ্বরী বললেন—একটা কথা বলি বৌমা। এই এক মাস বারো দিনের মধ্যে যে সব ঘটনা তোমার জীবনে ঘটে গেল এটাকে তুমি দুঃস্বপ্ন বলে মনে কোরো। আমার মত যদি শুনতে চাও মা, ফিরে গিয়ে কিছুদিন ধরে মনটাকে শান্ত করে তুমি নতুন করে পড়াশুনো আরম্ভ করো। পাস করো। তোমার বাপের যা সম্পত্তি আছে তাও তুমিই পাবে। কাজেই কালীপুরের সম্পত্তির জন্যে হ্যাংলামো কোরো না। সম্পত্তি নড় সর্বনেশে জিনিস মা। কিসের জন্যে কী ঘটছে তা বলা শক্ত। তারপর আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষ মেয়েদের অনেক অধিকার দিয়েছে। অনেক সামাজিক দুঃসহ বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। যদি পরে তোমার ঘর বাঁধতে ইচ্ছে হয় বেঁধো। আমরা কেউ তাতে কিছু মনে করবো না।

সন্ধ্যার মুখে সুরঞ্জন তাকে গাড়ির মধ্যে বললো—একটা কথা বলি। যদি কখনো কোনদিন কোন বন্ধুর প্রয়োজন অনুভব করো, যে কোন সাহায্যের দরকার বোধ করো, তুমি সেদিন নিঃসংকোচে আমাকে ডাক দিও। তুমি জানবে সেদিন আমি নিশ্চয় তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

এতদিন যা হয়নি আজ হলো। সুরঞ্জনের কথা শুনে হুহু করে ছেলেমানুষের মতো উনা কেঁদে উঠলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে সুরঞ্জনের ডান দিকের ঘাড়ের ওপর আপন মাথাটা রাখলো। স্থির হয়ে বসে রইলো সুরঞ্জন। একটু নড়লো না। তার গায়ের জামার ডান দিকটা উনার চোখের জলে নিঃশব্দে ভিজতে লাগলো।

আর সারাটা পথ কেউ কোন কথা বললো না। গাড়ি এসে রায় মঞ্জিলের সামনে দাঁড়ালো। উনা নেমে গেল। গাড়ির মুখ ঘুরলো।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শংকর মিশ্র। ট্রেন থেকে নেমে উনা গিয়ে বাপকে প্রণাম করামাত্র তিনি মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। সরকার মশাই উনার বাক্স ইত্যাদি নামিয়ে শংকরের কাছে এসে নমস্কার করলেন।

—সরকার মশায়। বললো উনা।

—ও! আসুন, আসুন। আমার গাড়ি তৈরীই আছে।

গাড়িতে বসে উনা বাপের মুখের দিকে চেয়ে দেখলো—তিনি যেন এই দু'মাসের মধ্যে আরো ক্লান্ত হয়ে গেছেন। চুলগুলো আরো পেকেছে। দেখে মনে হয় যেন রোগ ভোগ করে উঠেছেন।

—তোমার কি কোন অসুখ করেছিল বাপী? উনা প্রশ্ন করলো।

—না মা। আমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—না। সে সব কিছু না। ও এমনি বয়েস হচ্ছে তো!

আর কিছু বললো না উনা। চুপ করে বসে রইলো। সারা পথ পিতা পুত্রীর মধ্যে কোন কথা হলো না।

বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামতেই ললিতা দেবী বেরিয়ে এলেন। কোন কথা না বলে নিঃশব্দে উনার হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। মুখে কোন রেখা নেই, চোখে এক ফোঁটা জল নেই। হাতটি ধরে তাকে নিজের ঘরে পৌঁছে দিয়ে দরজার কাছ অবধি গিয়ে ফিরে চাইলেন। বললেন—খাবারদাবার কি হবিষ্যি করছো না—

—না।. আমার শ্বশুর হুকুম করেছেন আমি সবই খেতে পারবো—শুধু মাংস ছাড়া।

—ভাল। যেতে যেতে তাঁকে বলতে শোনা গেল—শ্বশুরের আদেশ তো মানাই উচিত। জানে উনা যে এই বিয়েকে প্রসন্ন মনে ললিতা দেবী গ্রহণ করেননি। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—পথের আলাপের লোককে পথেই রেখে আসা উচিত, তাকে

ঘরে ডেকে আনার কোন মানে হয় না। তারপর তাকে বিয়ে করা—কী জানি!

দরজার বাইরে কান্নার শব্দ শোনা গেল। চকিত হয়ে উঠলো উনা। কে কাঁদছে? ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখে দরজার পাশে বসে মনিয়া কাঁদছে? তার গলা জড়িয়ে তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো উনা। ঘণ্টাখানেক ধরে উনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে মনিয়া চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো উনা—এই ঘর তো সেই কুমারী উনা মিশ্রের ঘর। কত শান্তি, কত আনন্দ ছিল এই ঘরে। সে সব কোথায় গেল? দু'মাসের মধ্যে এমন কি বদল হলো যার জন্যে সেই পুরোনো ঘরে ফিরে এসে শান্তি পাচ্ছে না? বদল হয়েছে। হয়েছে বৈকি! সেই কুমারী মেয়েটি বিবাহিতা হয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে বিবাহিত জীবনের মাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করে, বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। সবই বদলে গেছে। ঘুম কিছুতেই আসছে না দেখে সে চন্দ্রচূড়ের একখানি ফটো বার করে বুকের ওপর দাঁড় করিয়ে দু'হাত দিয়ে ধরে থেকে সেই দিকে চেয়ে রইলো। আবার সেই পুরোনো কথাটা আবৃত্তি করলো—তুমি কি আত্মহত্যা করেছ? না খুন হয়েছে? এইভাবে অনেক্ষণ চেয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোরে উঠতেই সরকার মশায় এসে বললেন—বৌরানী, আমি এই গাড়িতেই চলে যাচ্ছি। আপনি কি কোন চিঠি দেবেন কর্তাকে?

—হ্যাঁ। বলে উনা ওপরে গিয়ে দুখানি চিঠি লিখে আনলো। একখানি দিতে হবে অম্বিকাকে। আর একখানি সময়মতো সুরঞ্জনকে। প্রণাম করে সরকার চলে গেল।

সেই দিন বিকেলে উনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই প্রান্তর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল সেই পাহাড়ের নীচে, যেখানে

প্রথম তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল চন্দ্রচূড়ের। অনেক কথা মনে পড়লো। সেই প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সব কথা। হাসি—গান—গল্প। বিয়ের প্রস্তাব। বিয়ে....। চোখ দিয়ে টপ টপ করে করে জল পড়ে উনার।

দু'দিন পরেই আবার একঘেয়ে লাগতে লাগলো জীবন। এরই মাঝে এক একদিন কাকুর কথা মনে পড়ে উনার। তার সেই সদানন্দময় সদাহাস্যময় কাকু অঙ্কুর মিশ্র। কতকাল যে তাঁর চিঠি পায় না উনা। মনে পড়লে মনটা ভারী হয়ে আসে তার। এত প্রশ্রয় উনাকে জীবনে আর কেউ দেয়নি।

সকালে মনিয়া আসে ঘরে। অনেকক্ষণ কাটে তার সঙ্গে গল্প করে। তারপরে নীচে যায়। গ্রামের পুরানো বান্ধবীরা এক আধজন আসে—তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটে। তারপর খাওয়া...ঘুম। বিকেলে উঠে কিছুদূর চলে যায় বেড়াতে বেড়াতে। কোন কোনদিন সেই প্রথম পরিচয়ের পাহাড়ের ধারে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

মাঝখানে শংকর মিশ্র কয়েকদিনের জন্য বেরিয়ে গেলেন—আবার ফিরে এলেন। কিন্তু এবার যেন আর তত অসুস্থ নয়। সন্ধ্যেবেলা ফিরে সোজা উঠে এলেন মেয়ের ঘরে।

এটা অঘটন। কখনো হয়নি। কখনো কোনদিন উনার মনে পড়ে না যে বাবা তার ঘরে এসেছেন। উনা বসে বই পড়ছিল। বাপের গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর পিতাকে ঘরে ডেকে নিয়ে এলো।

শংকর চেয়ারে বসে কোনরকম ভূমিকা না করেই বললেন—উনু, আমার মনে হচ্ছে মা, এখানে তোমার ভাল লাগছে না। সঙ্গী নেই, সাথী নেই—এভাবে তো তুমি মানুষ হওনি মা। তাই আমার মনে হয়, যদি তোমার ভাল লাগে, তাহলে কোলকাতায় গিয়ে হোস্টেলে থেকে আবার পড়াশোনা আরম্ভ করো।

—আমারও সেই ইচ্ছে বাবা। উনা বললো।

—খুব ভাল কথা। তাহলে একটা ভাল দিন দেখে কোলকাতায় চলে যাও। আর একটা কথা তোমাকে বলি মা। মানুষের জীবন খুব ছোট নয়। অনেকদিন তাকে বাঁচতে হয়। পঁচাত্তর আশি তো তোমার শ্বশুরেরই বয়স। তোমার পিসশাশুড়ীর পঁচাশি। এখনো তিনি খুব ফিট্। নয় কী?

—হ্যাঁ বাপী। খুব ফিট্।

—তাহলে মনে করো তিনি হয়তো একশো বছর খুব ভাল-ভাবেই বেঁচে থাকবেন। এই দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে যদি দেড় মাসের জন্যে কোন ছেলে এসে তোমার দেহ-মনে কোন তরঙ্গ তুলেও থাকে-মা, তাহলে শুধু তার স্মৃতিকে লালন করবার জন্যে আশি বছরের জীবনকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

উনা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

—তাই আমার মনে হয় কোলকাতায় গিয়ে এই নিরাভরণ চেহারা তুমি রেখো না। তুমি আমার যেমন কুমারী মেয়ে ছিলে, তাই হয়ে পড়াশুনো, খেলাধুলো, আমোদ আহ্লাদে মেতে যাও। কাপড়চোপড়, গয়নাগাঁটি, খাওয়া-দাওয়া চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে আলাপের আগে তুমি যা করতে তাই করো। এতে যদি হিন্দুশাস্ত্রের কাছে তোমার কোন অপরাধ হয় মা, তবে জেনো সে অপরাধ আমার —তোমার নয়। কারণ তোমাকে এই নির্দেশ দিয়েছি আমি।

উনা মাথা নীচু করে বাপের সব কথাই শুনলো, কিন্তু কোন জবাব দিল না। মনে মনে ভাবলো তার বাবা শংকর মিশ্রের মনের গঠন কত মডার্ন।

কোলকাতার হোস্টেলে আসার পর কার্তিক মাস পার হয়ে অগ্রহায়ণে পড়লো। এর মধ্যে একদিন এক বান্ধবীর বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো উনা। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার

মতো স্বাস্থ্য তার দুর্বল নয়। হোস্টেল সুপার অমিয়া দেবী পরদিন সকালেই একজন বড় ডাক্তারকে কল দিলেন। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ওপর। খুব অভিজ্ঞ এবং খুব পসার। মেয়েদের এই হোস্টেলে তিনিই চিকিৎসক।

অনেকক্ষণ ধরে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উনাকে পরীক্ষা করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। উনাকে বললেন—এটা নিতান্ত সাময়িক। প্রেসারটা খানিকটা লো। একটা দুটো দিন শুয়ে বিশ্রাম করে নাও মা। সেরে যাবে। এই বলে উনার ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা নেমে এলেন অমিয়া দেবীর ঘরে। বললেন —আপনার সঙ্গে কথা আছে।

—বসুন। বলুন।

ডাক্তার রায়চৌধুরী চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। কিন্তু আমি তো জানি হোস্টেলের জন্যে আপনি—

—কী ব্যাপার ডক্টর? উদ্বিগ্ন মুখে অমিয়া বললেন।

—হোস্টেলের সুনামের দিকে চেয়ে কথাটা আপনাকে বলতেই হচ্ছে। মেয়েটি মা হতে চলেছে।

খিলখিল করে ছোট মেয়ের মত হেসে উঠলেন অমিয়া দেবী। বললেন—না ডাক্তার। এতে আমার হোস্টেলের কোন দুর্নাম হবে না। উনা বিবাহিতা।

—আই সি!

—বিয়ের মাস দেড়েক পরে লাস্ট আশ্বিনে ওর স্বামী অ্যাক্-সিডেন্টে মারা যায়। বাপের এবং শ্বশুরের ইচ্ছেতে ও হোষ্টেলে ফিরে আসে। আমারই হোস্টেলের মেয়ে। চমৎকার মেয়ে।

এতক্ষণে ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটলো।

অমিয়া দেবী উনার পাশে এসে আস্তে আস্তে খবরটি দিলেন

তাকে। শুনে ধড়াস্ করে উঠলো উনার বুকের মধ্যে। সে চুপ করে অমিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। দেখতে দেখতে তার দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। চোখের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে গালের ওপর দিয়ে নামলো।

—একি! কাঁদে না—বোকা মেয়ে! তুমি মা হতে চলেছ। এর চাইতে আশার কথা আনন্দের কথা আর কী হতে পারে? বলতে বলতে নিজের চোখেও জল এসে গেল অমিয়া দেবীর। তিনি উনার হাতের ওপর দুটি চাপড় মেরে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

তাহলে? ভাবলো উনা। রায়পরিবারে রায়মঞ্জিলের বাস্তুদেবতা তাকে তো মুক্তি দিলেন না। কিন্তু সব যে ওলটপালট হয়ে গেল। সব পরিকল্পনা, ভবিষ্যতে বিলেতে যাওয়া—সব—সব যে ব্যর্থ হয়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো আর এক মুহূর্ত দেরি না করে এক্ষুণি তার বাবাকে এবং শ্বশুরকে এবং ভুবনেশ্বরীকে খবরটা জানানো দরকার।

বিছানায় উঠে বসে চিঠি লিখতে শুরু করলো উনা।

পিতার কাছ থেকে টেলিগ্রাম এলো: ব্লেসিংস্—বাপী। তারপরের চিঠি এলো ভুবনেশ্বরীর কাছ থেকে। সঙ্গে স্বরঞ্জনের ছোট্ট একটুকরো লিপি। ভুবনেশ্বরী লিখেছেন—

কল্যাণীয়া বৌমা,

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ লইবে। অপ্রত্যাশিত সংবাদে যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছি, তেমনি তোমার জন্য মনের মধ্যে বেদনাবোধও করিতেছি। ভাবিয়াছিলাম—জীবনের এই অধ্যায়টি তুমি ভবিষ্যতে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ভবিষ্যতে নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না। ভাগ্যদেবী রক্তমাংসের বন্ধনে জড়াইয়া

তোমাকে আবার এই দেশে টানিয়া আনিলেন। শুনিয়াছি জগতে যাহা ঘটে তাহা ভালর জন্যই ঘটে। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে তোমার কোন্ ভাল নিহিত আছে, খবরটা শোনা ইস্তক তাহাই ভাবিবার চেষ্টা করিতেছি।

পুনরায় আশীর্বাদান্তে—তোমার পিসীমা।

সঙ্গে সুরঞ্জনের চিঠি—রবীন্দ্রনাথ থেকে—

"সে দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষন্ন ছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে।"

—সুরঞ্জন

চোখের সামনে ভেসে উঠলো সুরঞ্জনের স্বাস্থ্যদীপ্ত অপূর্ব সুন্দর মুখ। মনে মনে ভাবলো উনা, ওর মধ্যে অনেক গুণ ছিল জানি কিন্তু এমন সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল তা তো জানতে পারিনি। সত্যি, এমনই মানুষ সুরঞ্জন, পাশে বসে থাকলে মনে হয় ওর উপস্থিতিই যেন বরাভয়।

আরো চার-পাঁচ দিন পরে চিঠি এলো অনুসূয়ার। সে লিখেছে—

বৌরানী,

জেঠু তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন পত্রপাঠ তোমাকে এখানে চলে আসতে। এখানকার নায়েব উমেশবাবু যাচ্ছেন কোলকাতায় তোমাকে নিয়ে আসতে। রায় বাড়ির নিয়ম—তাঁদের সন্তান বাড়ির বাইরে জন্মগ্রহণ করে না। আশা করি ভাল আছ।

ভালবাসা নিও। ইতি—অনুসূয়া।

চিঠি পড়ে হাসলো উনা। এমনকি ভুবনেশ্বরীর মতো রাশভারী মহিলার চিঠির মধ্যেও যে হৃদয়ের স্পর্শটুকু পাওয়া গেছে, অনুসূয়ার চিঠিতে তা অনুপস্থিত। একেবারে রসকসহীন কর্তব্যের ডাক। চিঠি হাতে নিয়ে চুপ করে ভাবতে লাগলো উনা! চাঁদের মৃত্যুর পর লাভবান হবে মোহন। অনুসূয়ার ছেলে। হয়তো অনুসূয়া তাই ভেবেছিলো। কাজেই উনার ভাবী মাতৃত্বের খবরে তার খুশী হওয়ার কথা নয়। খুশী যে হয়নি, এই চিঠি লেখার ধরনই তার প্রমাণ। তাহলে কি—! কিন্তু কী রকম করে? কী ভাবে? তার ঘরে আসার রাস্তা আছে অন্য দিক দিয়ে। সেদিক দিয়ে ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে আবার সেই পথে বেরিয়ে গেলে কেউ জানতেও পারবে না।

কালীপুরে গিয়ে এবার থেকে তাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। কেননা এই সন্তান কিছু কিছু মানুষের কাছে অবাঞ্ছিত। সম্পত্তি যদি তাদের পেতেই হয় তবে এই সন্তান তার বাধাস্বরূপ। এইরকম করে নানা দিক থেকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো উনা।

ঠিক তার পরদিনের পরের দিন বৃদ্ধ নায়েব উমেশবাবু এসে হাজির হলেন হোষ্টেলে। দেখা করে বললেন—বৌরানী, কর্তা বলে দিয়েছেন আসছে কাল দিনটা খুব ভাল। কালই কিন্তু আমাদের রওনা হতে হবে।

—কালই রওনা হবো কাকা। উনা বললো।

বহুদিনের বৃদ্ধ নায়েব এবার কেঁদে ফেললেন। বললেন—বৌরানী, আমাদের তো আর আশা ভরসা কিছুই ছিল না। সূর্য নেই, চাঁদ নেই, এত অন্ধকার তো জীবনে দেখিনি। অনু আমাদের মেয়ে হতে পারে কিন্তু তার সন্তান—সে তো অন্য বংশের, অন্য রক্তের। আজ চারশো বছর পরে রায়বাড়ি চলে যাচ্ছিলো অন্য লোকের অন্য বংশের হাতে। এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখা দিল নক্ষত্র। তারই আলোতে দেখলাম বৌরানী, রায়বংশ

নিভে যায়নি, চাঁদ ডুবে গেছে কিন্তু নক্ষত্র উঠেছে। আলো পাব আমরা। আচ্ছা, আমি চলি বৌরানী। আমি একেবারে তৈরী হয়ে আসবো। আমাদের গাড়ি হচ্ছে বেলা সাড়ে দশটায়।

চলে গেল উমেশ নায়েব।

নক্ষত্র। ভাবলো উনা। তার যদি ছেলে হয় তবে নাম রাখবে নক্ষত্র। নক্ষত্র রায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন। হতভাগ্য নক্ষত্র রয়। তা হোক—তবু সে নক্ষত্রই রাখবে নাম তার ছেলের। আর যদি মেয়ে হয়—এক মুহূর্ত ভেবে নিল উনা। তাহলে নাম রাখবে তারা। সূর্য, চন্দ্র, তারা। নাঃ, ছেলেই হবে তার।

হঠাৎ অনেকদিন পরে স্বামীর ফোটোটাকে বার করে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো উনা। খুব মন দিয়ে। যেন কোন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজছে।

পরদিন আবার নতুন করে সকলের কাছে বিদায় নেবার পালা। অমিয়া দেবী অত্যন্ত আদর করলেন উনাকে। বললেন—সন্তানের মধ্যে দিয়ে আপন স্বপ্ন সার্থক করো উনা। যে গল্প বলেছ শ্বশুরবাড়ির তাতে মনে হয় উপস্থিতির দরকার।···বান্ধবীরাও জলভরা চোখে প্রিয় বান্ধবী উনাকে বিদায় দিল।

ট্রেনে করে যেতে যেতে উনার মনে পড়লো চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে এই গাড়িতে চেপেই অজানা কালীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। সেদিন মনে মনে কত না ছিল ভয়, কত আতঙ্ক, কত না উৎকণ্ঠা। দু'মাসের মধ্যে কালীপুরের রায় বাড়ির চন্দ্রচূড়ের গল্প শেষ হয়ে গেল, ফিরে এলো উনা তার নিজের মৌলিক কাহিনীর পরিবেশে মনকে তৈরি করে নিল—তার বিয়ে হয়নি, কালীপুর তারাপুর কোথাও নেই, চন্দ্রচূড় নামে কোন মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। কিন্তু "কী ছিল বিধাতার মনে"! আজ আবার সে

চলেছে সেই গাড়িতে চেপে সেই সদ্য-অস্বীকৃত চন্দ্রচূড়ের সন্তানকে কালীপুরে পৌঁছে দিতে। হাসি পেল উনার। জন্মমৃত্যুর ধারাও বোধহয় এই রকম। নিঃশেষে সব মুছে দিয়ে যে চলে যায়, সেই বোধহয় আবার ফিরে আসে এই পৃথিবীর রূপ রস শব্দ গন্ধের টানে। কী জানি!

রাত্রে স্টেশনে নেমে এবার আর বসে থাকতে হলো না। মোহন এসেছে গাড়ী নিয়ে। কিন্তু ঐ সামান্য সময়ের মধ্যে মোহনের পরিবর্তন লক্ষ্য করলো উনা। মোহন শুধু একটি প্রশ্ন করেছিল —কেমন আছ? —ভাল। তোমরা সবাই ভাল আছ তো? উনা বলেছিল। তারপর সারাটা পথ আর একটা কথাও বলেনি মোহন।

অত রাত্রেও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন অম্বিকাপ্রসাদ। উনা গিয়ে প্রণাম করামাত্র তিনি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বললেন—শরীর ভাল আছে তো মা?

—হ্যাঁ বাবা।

—বেয়াইমশায় কেমন আছেন?

—ভাল। ভাল আছেন। আপনার শরীর এখন কেমন আছে বাবা?

—তোমার চিঠিটা পাবার পর থেকেই দেহটা যেন হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠেছে মা। নইলে তুমি চলে যাবার পর খুবই ভেঙে পড়েছিল। গোকুল তো একদিন এসে দেখে বললো—এবার আস্তে আস্তে যাবার জন্যে তৈরী হন। যাকে যা দেবার এইবেলা দিয়ে দিন। এই বলে হাসতে হাসতে বললেন—জগতে কার জন্যে কে বেঁচে থাকে এ বলা খুব শক্ত মা। এই বলে উনার কাঁধে ভর দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললেন—নইলে মোহনকে সব দিয়ে দেবার জন্য যখন উইলের খসড়া করছি সেই সময় এলো তোমার

চিঠি। খসড়াটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম—তোর আর সম্পত্তি পাওয়া হলো না রে মোহন! চাঁদ বাধা দিয়েছে।

ঠিক পাশে পাশে হাঁটছিল অনুসূয়া। বললো—ওসব কথা এখন থাক না জেঠু। সেই মজার কথা বৌরানীকে আমিই বলবো। শোন বৌরানী, তোমার থাকবার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের ঘরের ঠিক নীচের ঘরখানায়—দোতলায়। এই অবস্থার তিনতলায় ওঠা-নামা করা ঠিক হবে না। গোকুলকাকাও বলছিলেন আর আমাদের এখানে আর একজন খুব বড় ডাক্তার এসে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন তিনিও বলছিলেন। এই বলে অনুসূয়া অম্বিকাকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে উনাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

দোতলার ঘর ঠিক তেতলার ঘরেরই অনুরূপ। শুধু গোল বারান্দাটা নেই। সেখানে একটি জানালা আছে। ওইরকমই বড় ঘর। পেছন দিকে দরজা। সেই দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে যাওয়া যায়। সেই রকম লম্বা বারান্দা। বারান্দার ধারে ধারে অব্যবহৃত ঘরের সারি। দরজাটা খোলা ছিল। উনা বন্ধ করে দিল। শরীর মন দুই-ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ট্রেন জার্নিতে। শীলা এসে গরম দুধ আর সন্দেশ দিয়ে গেল। খেয়ে শুয়ে পড়লো উনা। ঘরটা অপরিচিত। তাই আলোটা জ্বেলেই রাখলো।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো উনা। ব্যাপার তাহলে অনেকদূর গড়িয়েছিল। চাঁদের মৃত্যুর পরেই মোহনের নামে উইল তৈরী হচ্ছিলো সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য। বাঃ! তাহলে উনার চিঠি খুবই বিরক্ত করেছে অনুসূয়াকে, মোহনকে। তাই মোহনের মুখ খুব গম্ভীর। সারাটা পথ একটা কথাও কয়নি।

মাথার মধ্যে গরম লাগছে। উনা উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালো। চাঁদের তিথি। বাইরে বেশ জ্যোৎস্না। চোখে পড়লো সুদূরবিস্তারী দশপীঠের ভগ্নস্তূপ। অল্প অল্প কুয়াসা করেছে। বাতাসে শীতের আমেজ। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দশপীঠের দিকে চেয়ে

রইলো উনা। একবার মনে হলো দূরে দশপীঠের ভাঙা মন্দিরগুলোর পাশ দিয়ে কে একজন চলে যাচ্ছে। পরক্ষণেই তার মনে হলো চোখের ভুল। এত রাত্রে ওই সর্বনাশা জায়গায় সাপের কামড় খেতে কেউ যাবে না। জ্যোৎস্না, কুয়াসা - ইউলিসন তো এমনি সময়েই দেখা যায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম পাওয়াতে উনা এসে বিছানায় শুয়ে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই অনুভব করলো উনা শীত পড়েছে। বড় স্যুটকেশ খুলে একখানা ছোট কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়িয়ে নিল, তারপর দরজা খুলে বারান্দায় পা দিতেই দেখা গেল ডানদিকের বারান্দার তিনতলায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন ত্র্যম্বকপ্রসাদ। উনা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন—আমি জানতাম মা, তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। না এসে কোন উপায় নেই। রায়মঞ্জিলের বাস্তুদেবতা আরো কিছু খেলা দেখাবেন যে !

—কী খেলা কাকা ? উনা জিজ্ঞাসা করলো।

—সে বড় মজার খেলা মা। সে ভারী মজার খেলা। আমি যে নখদর্পণে দেখে রেখেছি সব। সব—সব। আগাগোড়া। ইংরেজীতে যাকে বলে টপ্ টু বটম্। যাই হোক, তুমি খাওয়া-দাওয়ার পরে একবার আমার ঘরে এসো। অনেক কথা আছে। সব তোমাকে বলবো। উঁ ! সব বলবো।

—আচ্ছা।

ত্র্যম্বক ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। "রায়মঞ্জিলের বাস্তুদেবতা আরো কিছু খেলা দেখাবেন যে!"—মানে কি একথার ? ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হলের মধ্যে দিয়ে সোজা বাইরের বাগানে নেমে গেল উনা। দেউড়ির সিপাই সেলাম করে গেট খুলে দিল। উনা বললো—যদি কেউ খোঁজ করে আমার, বোলো যে বেড়াতে গেছি।

—যে আজ্ঞে বৌরানী।

দশপীঠের ভেতর দিয়ে পথ। তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করলো উনা। আর দশপীঠে যেন ভয় নেই। তার সব ভয়কে এই পথ দিয়ে নিয়ে গিয়ে দূরে ওই নদীর ধারে পুড়িয়ে রেখে এসেছে উনা। সোজা সে শ্মশানের দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

নদীর কাছাকাছি এসে সে চমকে উঠল। চন্দ্রচূড়ের চিতার উপর একটা বেদি ও একটা স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে, তারই খুব কাছে একটা স্কুটার শুইয়ে রেখে কে একজন এইদিকে পেছন ফিরে নদীর দিকে মুখ করে বসে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না উনা। পেছন থেকে লোকটাকে দেখতে অবিকল চন্দ্রচূড়ের মতো।

হাঁপিয়ে পড়েছিল উনা। একটু দাঁড়িয়ে দম নিল। তারপর একপা দু'পা করে এগিয়ে গেল। লোকটির খুব কাছে গিয়ে সে আরো অবাক হলো। বসে আছে সুরঞ্জন। স্কুটারে করে এসেছে।

নদীর পরপারে সূর্য উঠেছে। তারই আলো পড়েছে এপারে দুটি স্মৃতিবেদির ওপর। একটি সূর্যের। একটি চাঁদের। উনা এগিয়ে গিয়ে ধপ্ করে সুরঞ্জনের পাশে বসে পড়তেই সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলো।

—এ যে আমি। বললো উনা।

ফিরে চাইল সুরঞ্জন। দৃষ্টির মধ্যে তখনো গভীর চিন্তার স্পর্শ। বেশ কিছুক্ষণ পরে তার মুখে হাসি ফুটলো। এগিয়ে এসে উনার পাশে এসে বসে পড়ে বললো—এত ভোরে উঠে শ্মশানে এসেছো কেন ?

—ঠিক ওই প্রশ্নটা আমিও তো তোমাকে করতে পারি। বললো উনা।

—আমি তো প্রায়ই আসি এখানে। ওইদিকে একটু তফাতে আমার বাবার আর মার স্মৃতিবেদি। মাঝে মাঝে খুব ভোরে চলে এসে বসে বসে ভাবি। ভাবনাটা বেশ ভাল হয়। তারপর

সূর্য উঠলে চলে যাই। এই পথটা দিয়ে তারাপুর আরো কাছে।

—পিসীমা কেমন আছেন ?

—ভাল। কাল রাত্রে হঠাৎ জিগ্যেস করলেন—সুরো, বৌমার আজ আসার কথা না ? আর কিছু না। শুধু এইটুকু জিগ্যেস করে চলে গেলেন। এই বলে উনার দিকে চেয়ে সুরঞ্জন বললো —কিন্তু তুমি দেখতে আরো সুন্দর হয়েছো!

লাল হয়ে উঠলো চিবুকের দু'পাশটা উনার। চোখ না তুলেই বললো—কেন ? দেখতে কি খুবই কুৎসিত ছিলাম ?

—এই দেখ! আমি তা বলিনি। শুনেছিলাম মাতৃত্ব নারীর রূপকে মহিমা দান করে—কথাটা দেখলাম সত্যি।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উনা বললো—কাল রাত্রে বাড়িতে পা দিয়েই একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম।

—কী কথা ?

—আমার চিঠি যেদিন এলো, সেদিন শ্বশুরমশায় মোহনকে সব সম্পত্তি হস্তান্তর করবার উইলের খসড়া তৈরি করছিলেন। আমার চিঠিতে সব খবর পেয়ে খসড়া ছিঁড়ে ফেলে মোহনকে বলেন—তোর কপাল খারাপ। চাঁদ বাধা দিল।

সুরঞ্জন চেয়ে ছিল উনার দিকে। চেয়েই রইলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললো—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

—মোহন কী বলেছে ? কিংবা তার মা ?

—সেটা শুনিনি। হয়তো বাবা বলতেন, কিন্তু দিদি—

—বলতে দিলো না ?

—প্রায় সেই রকম।

—হুঁ। বলে চুপ করে বসে রইলো সুরঞ্জন। তারপর হঠাৎ উনার দিকে চেয়ে বললো—তুমি এদিকে এলে কেন ?

—ঘুম থেকে উঠেই মনটা চাইছিল একবার দেখে যেতে।

—কী দেখে যেতে? শ্মশান? চিতার ওপর স্মৃতিবেদি? কিন্তু কেন?

বিপদে পড়লো উনা। বললো—কেন আবার, এমনি!

—ও! এমনি! বলে সুরঞ্জন চুপ করে গেল। তার পরেই বললো—তুমি কি তোমার পুরোনো ঘরেই আছ?

—না। দোতলায়। ঠিক নীচের ঘরটায়।

—ঠিক নীচের ঘরটায়?

—হ্যাঁ। কেন?

—না। এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

কিছুক্ষণ সময় আবার কাটলো নীরবে। সুরঞ্জন বললো—চল। যাবে তো?

—হ্যাঁ।

—স্কুটারের পেছনে উঠতে পারবে তো? না, পড়ে যাবে?

—স্কুটার তো আমিও চালাতে পারি।

—পারো নাকি? কে শেখালে?

—যে পারে শেখাতে।

—চাঁদ?

উনা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো। সুরঞ্জন বললো—বিশ্বাস করলাম। কিন্তু পরীক্ষা দেবার দরকার নেই। আপাততঃ আমার পেছনে ওঠো। যাবে কোথায়? আমাদের বাড়ি, না বাড়ি?

—এখন বাড়িতেই যাই। দেরি দেখে হয়তো ওঁরা খোঁজাখুঁজি করবেন।

—হুঁ। তাহলে চলো। এই বলে স্কুটারটাকে তুলে নিয়ে ষ্টার্ট দিল সুরঞ্জন। উনা বসলো পেছনে। গাড়ি ছুটলো। উনা দু'হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরলো সুরঞ্জনের। দশপীঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ি এসে বড়রাস্তায় পড়তেই উনা নেমে পড়লো। বললো—সোলং।

সোলং বলে চোখের পলকে গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে গেল সুরঞ্জন। বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে উনার চোখে পড়লো তার তেতলার ঘরের গোল বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে একটি নারীমূর্তি। সে একদৃষ্টে এদিকেই চেয়ে আছে।

উনা দেখলো সে অনুসূয়া।

যাওয়া হয়নি ত্র্যম্বকের কাছে। যেতে ইচ্ছে করেনি উনার। কী জানি আবার ফস্ করে কী বলবেন—শুনে মন খারাপ হয়ে যাবে। তার চাইতে না যাওয়া ভাল, না জানা ভাল। দরকার কী? পৃথিবীতে কটা লোক নিজের ভবিষ্যৎ জানে? তাদের যখন চলছে, তখন এই অর্ধউন্মাদ খুড়শ্বশুরের কথা না শুনে উনারও চলবে।

এবার যেন অম্বিকা বড্ড কাছে কাছে রাখতে চাইছেন উনাকে। আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা অন্তরই হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠছেন—বৌমা কোথায়? তাকে ডাক আমার কাছে। আমি অনেকক্ষণ দেখিনি তাকে। তখন যে কেউ গিয়ে উনা যেখানে থাক তাকে ডেকে আনবে। উনা এসে শ্বশুরের কাছে দাঁড়াবে। তিনি তাকে কাছে বসিয়ে ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখবেন। তারপর বলবেন—কেমন আছ মা?

—ভাল আছি বাবা।

এক এক সময় হঠাৎ অম্বিকা বলেন—আমি তোমাকে এইভাবে বার বার ডেকে পাঠাই বলে তুমি রাগ করো না তো মা?

—না বাবা। আপনি বললে তো আমি আপনার কাছেই বসে থাকতে পারি। বলে উনা।

—না না। বসে থাকতে হবে না। তাতে শরীর খারাপ হবে হয়তো। তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। এই বলে বৃদ্ধ নিজের মনেই হাসেন। তারপর বলেন—কী জানি! ভেতরে ভেতরে বড়

দুর্বল হয়ে পড়েছি মা! এমন ছিলাম না। কিন্তু তোমার চিঠি পাবার পর থেকে এমন একটা স্বপ্ন ছেলেমানুষের মত পেয়ে বসেছে—। কথা শেষ করেন না অম্বিকা।

উনা দেখে জল চকচক করছে বৃদ্ধের চোখে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে উনা। সে শুনেছে শক্ত মানুষ বলে শ্বশুরের খ্যাতি আছে। সেই মানুষ গলে যাচ্ছেন তার চোখের সামনে। তবু সে সাহস করে প্রশ্ন করে—কী স্বপ্ন বাবা

—স্বপ্ন—বলে থেমে অম্বিকা চশমাটা খুলে কাচ দুটো মুছে নেন। চোখটাও মুছে নেন। বলেন—স্বপ্ন—মানে আমার তো সূর্য চন্দ্র ডুবে গেছে—আলো তো ছিল না একেবারেই। সবটাই তো অন্ধকার। হঠাৎ খবরটা পেয়ে যেন আলো দেখতে পেলাম। মনে হলো পূর্বদিক ফরসা হয়ে রায়মঞ্জিলে ভোর হচ্ছে। হয়েছে কি জান মা, আমরা তো হিন্দু, তার ওপর ব্রাহ্মণ। আমাকে পিণ্ড যারা দেবে তারাই পিণ্ডের প্রত্যাশী হয়ে চলে গেল। ভাবতাম—তাহলে কি আমি হা হা করে অনন্তকাল মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াব? এতটুকু জল পাব না কারো হাত থেকে? নিজের রক্তে জাত সন্তান ছাড়া তো অন্য কারো জল পিণ্ড পাওয়া যায় না। তাই স্বপ্ন দেখি একলা ঘরে বসে বসে যদি পুত্রসন্তান হয়—

উনার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। সে বললো—বাবা, আমি ভেবেছি তাহলে তার নাম রাখবো নক্ষত্র।

প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে অম্বিকাপ্রসাদের মুখ। বলেন—বা-বা! ভারী সুন্দর নাম। হ্যাঁ, নাইবা হলো চাঁদ সূর্য! তবু নক্ষত্রের কাছ থেকেও তো আলোর আশা করে মানুষ। ভাল—ভাল নাম।

আজ দিন দশেক এসেছে উনা। এই ধরনের কথা প্রত্যহ হয় শ্বশুরের সঙ্গে। তারাপুরে যাবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না। অবিশ্যি খবরও পাঠাননি ভুবনেশ্বরী।

ঘুমের মধ্যেই উনা শুনতে লাগলো কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে—উনা···উনা···উনা! ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। চেয়ে দেখলো জানালা দিয়ে শুক্লা ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না এসে বিছানায় পড়েছে, তার গায়ে পড়েছে। হ্যাঁ, ত্রয়োদশীই বটে। কেননা পরশু সত্যনারায়ণ পূজোর কথা বলেছেন অম্বিকা।

শীত পড়েছে বলে গায়ে চাদর দেওয়া ছিল। ডাকলো কে তাকে? ঘুমজড়ানো চোখ দুটোকে ঈষৎ বিস্ফারিত করে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে ঘোরালো। কেরোসিন টেবিল ল্যাম্পটা খুব কমানো ছিল—নিভে গেছে। কিন্তু জ্যোৎস্না থাকাতে ঘরের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটোকে খাটের পায়ের দিকে নিয়ে যেতেই বুকের স্পন্দন থেমে এলো উনার। খাটের পেছনে তার পায়ের দিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একজন রক্তবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিহিত জটাজুটধারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। চোখ দুটো তার ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে। কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই দিকে চেয়ে রইলো উনা। তান্ত্রিকের ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। উনার মনে হলো তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চিরকালের সাহসী মেয়ে সে। বনেবাদাড়ে জঙ্গলে-পাহাড়ে চিরকাল একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। তার ভেতর থেকে কে যেন বলছে ক্রমাগত—উনা, জেগে ওঠো, পুরো জেগে ওঠো—চেঁচিয়ে ওঠো···নইলে সর্বনাশ! প্রাণপণ শক্তি সংগ্রহ করে উনা চাপা চীৎকার করে উঠলো—কে? চেষ্টা করলো গায়ের চাদরটা ফেলে দিয়ে বিছানায় উঠে বসতে।

অবশেষে উঠে বসলো উনা। কিন্তু কোথায় তান্ত্রিক? কোথায় সেই রক্তবস্ত্রপরা সন্ন্যাসী? কাউকে ডাকবার জন্য উনা ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা খুলে ফেললো—ডাকলো—শীলা। শীলা! সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় এবং সিঁড়ির ধার থেকে অনুসূয়া ছুটে এলো।

—কী হয়েছে বৌরানী? শীলাকে ডাকছো কেন?

—আমার ঘরে একটা লোক ঢুকেছিল।

—লোক! সেকি?

—হ্যাঁ, একজন লাল কাপড় চাদর পরা জটাওলা সন্ন্যাসী!

কিছুক্ষণ চুপ করে উনার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললো অনুসূয়া—তুমি স্বপ্ন দেখেছো বৌরানী। চলো ঘরে চলো!

—স্বপ্ন দেখেছি মানে? খাটের ধারে আমার পায়ের দিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে কটমট করে চেয়ে ছিল আমার দিকে। আমি স্পষ্ট দেখেছি। স্বপ্ন দেখেছি মানে?

সঙ্গে সঙ্গে মোহন এসে দাঁড়ালো। বললো—ব্যাপারটা কী? রাত তিনটের সময় এভাবে আসর জমাচ্ছো কেন দুজনে? কী হলো?

—বৌরানী বলছে ওর ঘরে একটা লোক ঢুকেছিল।

—লোক? লোক মানে?

—হ্যাঁ। একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী—লাল কাপড় চাদর পরা!

হা হা করে হেসে উঠলো মোহন। বললো—মামী কি আজকাল ডিটেকটিভ বইটই বেশী পড়ছো? নইলে এরকম জলজ্যান্ত স্বপ্ন তো দেখা যায় না।

—চুপ করে চেয়ে দেখলো উনা দুজনকে। আস্তে বললো—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তোমরা দুজনেই এটাকে মিথ্যে প্রমাণ করতে চাইছো কেন? যা আমি স্পষ্ট নিজের চোখে দেখেছি—

কী করে নিজের চোখে দেখবে বৌরানী! রায়মঞ্জিল দুর্গের মতো বাড়ি। এর মধ্যে একটা বাইরের লোক তোমার শোবার ঘরে এসে—তাই বলছিলাম তুমি স্বপ্ন দেখেছো! যাও শুয়ে পড়গে। আমি শীলাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

উনা নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললো। তারপর চারদিক দেখতে লাগলো। এগিয়ে গিয়ে পেছন দিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়েই সে দেখতে পেলো দরজার খিলটা খোলা। কিছুক্ষণ ভাবলো উনা। হ্যাঁ, তার মনে পড়েছে, আজই বিকেলে, দুপুরের ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সে এই দরজার খিল লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

শীলা ঢুকলো। বললো—কী হয়েছে বৌরানী? দিদিরানী বলছিলেন আপনি নাকি ভয় পেয়েছেন?

—হ্যাঁ। তুই ছোট পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালা তো। এই বলে ফিরে এসে বিছানায় বসলো উনা। তোলপাড় করছে মনের মধ্যে। কে ঢুকতে পারে? কার এত সাহস? ঘুমন্ত আমাকে সে কতক্ষণ থেকে দেখছিল কে জানে! শিরশির করে ওঠে গায়ের মধ্যে। অলৌকিক? কিন্তু যেরকম চোখের পলকে সে ঘর থেকে মিলিয়ে গেছে—তাতে—! না না, তা হতেই পারে না। যাকে দেখেছে উনা সে মানুষ।

পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে শীলা ঘরে এলো। উনা বললো—আয় আমার সঙ্গে।

পেছনের দরজা খোলাই ছিল, সেটা দিয়ে বাড়ির ভেতরের বারান্দায় পড়লো ওরা। পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোতে সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। উনা ভাল করে মেঝেতে চোখ রেখে দেখছিল। কিন্তু নাঃ, কোথাও কোন পায়ের দাগ নেই।

—তুই কি আজ এদিকটা ঝাঁট দিয়েছিলি?

—না বৌরানী।

—ভাল করে ছাখ তো! মনে হচ্ছে না, আজই পরিষ্কার করা হয়েছে এদিককার বারান্দাটা।

—হ্যাঁ।

দুজনে তন্নতন্ন করে দেখলো। কিন্তু কোথাও কিছু সন্দেহজনক

পাওয়া গেল না। ডান পাশে সারি সারি ঘর। কোনটায় তালা দেওয়া আছে, কোনটাতে নেই। উনার ঘর থেকে বেরিয়ে ঠিক ডান পাশে কোণার দিকে একটা ছোট ঘর। দরজায় তালা নেই। পাল্লা দুটো ঠেলে খুলে ফেললো উনা। ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনে অনুসূয়ার গলা শোনা গেল—এত রাত্রে এসব ঘরে ঢুকো না বৌরানী !

ফিরে চাইলো অনুসূয়ার দিকে উনা। শান্ত গলায় আবার বললো অনুসূয়া—স্বপ্নই দেখেছো তুমি। তাছাড়া এ অঞ্চলে জ্যোৎস্না রাতে এদিকে ওদিকে অনেক কিছুই দেখা যায়। তা নিয়ে আমরা কেউ হৈ হৈ করিনে। চল, ঘরে চল।

উনা আর কোন কথা বললো না। শীলাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। পেছনে এলো অনুসূয়া। অনুসূয়া বললো—এখনো ভোর হতে দেরি আছে। তুমি শুয়ে পড়। তোমার কাছে শীলা শুয়ে থাকছে।

চলে গেল অনুসূয়া।

—দরজাটা বন্ধ করে দে শীলা।

শীলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিয়ে এসে বললো—খুব আশ্চর্য বৌরানী !

—কি রে ? কী আশ্চর্য ?

—এই ঘরের পাশের কোণের দিকের ঘরটা, যেটার পাল্লা দুটো খুলে ফেলেছিলেন—

—হ্যাঁ। কী সেখানে ?

—সে ঘরটার মেঝেও আজ পরিষ্কার করা হয়েছে।

শুয়ে পড়েছিল উনা। উঠে বসলো। বললো—আমি তোকে বলছি শীলা, নিশ্চয় কোন লোক ঢুকেছিল এঘরে। তুই কি বারান্দার দিকে যাবার ওই দরজাটা খুলেছিলি ?

—না বৌরানী।

অথচ আমি বিকালে বেরোবার সময় খিল আর ছিটকিনি দুইই লাগিয়েছিলাম।

—কে খুললো?

—সেইখানেই রহস্য। কাল সকাল থেকে ওই দরজাটায় আমি তালা লাগাব। তাছাড়া বেরোবার সময় আমার ঘরেও তালা লাগিয়ে যাব। আরো সাবধান হতে হবে আমাকে বুঝতে পারছি।

এরপরে দুজনেই শুয়ে পড়লো।

—তুই কি আমার কাছে শুতে পারবি?

—না বৌরানী। অপরাধ হবে আমার।

—তাহলে এক কাজ কর—তুই আমার পায়ের দিকটায় শো। তাতে কোন অপরাধ হবে না।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙলো উনার তখন বেলা সাতটা বেজে গেছে। উঠে মুখটুখ ধুয়ে চা খেলো উনা। তারপর বড় একটা তালা আনিয়ে পেছনের দরজায় লাগিয়ে চাবি নিজের রিংয়ে লাগালো। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরেও তালা দিল। নেমে গেল শ্বশুরের ঘরে।

সেখানে কিছুক্ষণ বসতেই একটি প্রৌঢ় মানুষকে নিয়ে ঢুকলো অনুসূয়া। বললো—জেঠু, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

—আরে আসুন আসুন ডাঃ শীল। আপনি নতুন এসে গ্রামে বসেছেন খবর পেয়েছি। ভাবছিলাম আপনার মত বড় ডাক্তার এই ছোট্ট গ্রামে কেন এলেন! এখানে কী প্র্যাকটিস হবে?

—প্র্যাকটিসের কথা নয় মিঃ রায়। জনসেবা। কোলকাতায় বসে মানুষের সেবা করা যায় না। তাই বেছে বেছে এই ঐতিহাসিক গ্রামখানিতে এসেছি। এর দশপীঠের কিংবদন্তীই আমাকে টেনে এনেছে। যাই হোক আপনি খবর পাঠিয়েছেন বৌরানীকে একবার দেখে যেতে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বৌমাকে একবার দেখে যান দিকিনি।

—আমার কী হয়েছে? অবাক হয়ে বললো উনা।

ডাক্তার শীল হাসলেন। বললেন—কিছু হলেই যে ডাক্তার আসে, না হলে আসে না, এ ধারণা আপনার ভুল বৌরানী। এটা জাস্ট্ একটা চেকিং।

ডাক্তার বেশ কিছুক্ষণ ধরে উনাকে পরীক্ষা করে বললেন—প্রেসারটা খুব লো। ঠিক আছে। এখন কোন ওষুধ দিচ্ছি না। শুধু খাওয়াদাওয়ার দিকে একটু নজর রাখবেন। আমি পরশু আবার আসবো।

—গোকুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—না। গোকুলদার সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি। আর তিনিও শিষ্যসেবক নিয়ে খুব ব্যস্ত—

অম্বিকা হাসলেন!—না না, শিষ্যসেবক নেই মশায় তাঁর। তিনি কবিরাজী করেন। যজমান বলতে বোধহয় আমরাই এক ঘর।

—তা হবে। আমি ঠিক অত জানিনে। আমার সঙ্গে তো নতুন আলাপ।

ডাক্তার উঠলেন। উনাও উঠলো। বললো—বাবা, আমি একটু তারাপুরে যাচ্ছি। যদি ফিরতে দেরি হয়, আপনি যেন ভাববেন না।

—তুমি ভুবনদিদির কাছে যাচ্ছো? তা যাও। গাড়ি নিয়ে যাও।

অনুসূয়া দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। বললো—কিন্তু জেঠু, বৌরানীর এইভাবে ছুট্ ছুট্ করে তারাপুর যাওয়া আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া এই সময়টা গাড়ির ঝাঁকুনি—হাঁটাহাঁটি না করাই ভালো।

—তা জানি। বললেন অম্বিকা।—কিন্তু এখানে তো একেবারে একলা। ভুবনদিদি ওকে ভালবাসে,—যাক্ না, ঘুরে আসুক।

উনা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে দাঁড়ালো। গাড়ি এলো। একটু

পরেই তারাপুর প্রাসাদের সামনে নেমে উনা বললো—তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। আমি চলে যাব।

—যো হুকুম বহুরানী। কোচম্যান সেলাম করে গাড়ি ঘোরালো।

সুরঞ্জন বাড়িতে নেই। ভোরে বেরিয়েছে—দশটায় মধ্যেই ফিরবে। ভুবনেশ্বরী সাদরে অভ্যর্থনা করলেন নিজের ঘরে উনাকে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে উনা বললো—কথা আছে পিসীমা।

—আমি জানি কথা আছে। কিন্তু তুমি এখন বিশ্রাম করো রীতিমত শীত পড়েছে। গরম চা খাও। তারপর কথা হবে। তাছাড়া এবেলায় তোমাকে আমি যেতে দিচ্ছি না।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে ভুবনেশ্বরীকে সব কথা বললো উনা। রাত্রের ঘটনা। সকালের ঘটনা। মায় ডাক্তার দেখা পর্যন্ত। বলে চেয়ে দেখলো ভুবনেশ্বরী জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। তিনি যেন হারিয়ে গেছেন। বড় বড় চোখের দৃষ্টি জানালার ভেতর দিয়ে সুদূর আকাশে নিবদ্ধ। অশ্বস্তি বোধ করলো উনা। উনার কথা যেন ভুলে গেছেন ভুবনেশ্বরী। অনেকক্ষণ পরে ভুবনেশ্বরী চোখ নামিয়ে উনার দিকে চেয়ে বললেন—হুঁ! কিন্তু তুমি ভয় পাওনি তো মা-মণি?

—মিথ্যে কথা বলবো না পিসীমা। তখন কিন্তু আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।

—না মা। ভয় পাওয়া তোমার একেবারে চলবে না। আমার মনে হচ্ছে যারা এসব করছে, তারা বোধহয় তোমাকে ভয় পাওয়াতেই চাইছে। তোমার আর কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে তাদের নেই।

—যারা বলছেন, তাহলে কি এর মধ্যে একজনের বেশী লোক আছে?

—থাকা কি খুব বিচিত্র?

—কেন? আমাকে ভয় পাইয়ে তাদের স্বার্থ কী?

—তোমার পেটের সন্তানটি যাতে নষ্ট হয়ে যায়।

এইবার সব বুঝতে পারলে উনা। আর তার কাছে কোন ধোঁয়া নেই, কুয়াশা নেই।

সওয়া দশটা নাগাদ সুরঞ্জন ফিরে এলো। অবাক হলো কিন্তু খুশী হলো উনাকে দেখে। বললো—দিদু, এ ভদ্রমহিলা কী ধরনের মানুষ বল তো? এ কি তারাপুর কালীপুরের দুশো বছরের ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলতে চায় নাকি?

—চাইই তো! বলল উনা।

ভুবনেশ্বরী হাসলেন। বললেন—তা যদি ও মেটাতে পারে মেটাক না। শোনা যায় তারাপুর কালীপুর তো দুশো বছর আগে এক ছিল। সুরো, তুই একটু পরে আমার কাছে একবার আসিস। একটু বিশেষ পরামর্শ আছে!

—আচ্ছা দিদু। বললো সুরঞ্জন।

দুপুরে যখন স্নান খাওয়াদাওয়া করছে উনা, সেই সময় সুরঞ্জন গিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এলো দিদুর সঙ্গে। বেরিয়ে এলো যখন তখন তার গম্ভীর মুখের দিকে চাওয়া যায় না।

বেলা তিনটে নাগাদ সুরঞ্জনই তাকে ঘুম থেকে জাগালো। বললো—মুখটুখ ধুয়ে নাও। তুমি যে বলেছিলে তারাপুর দেখবে—চলো!

গাড়ির মধ্যে বসে বললো সুরঞ্জন—তুমি চোখ রাখো বাইরের দিকে। আমি কথা বলে যাচ্ছি।

সুরঞ্জনও ওই এক কথা বললো—দিদুর কাছে সব শুনলাম। কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না। একদম না। সব সময় মনে রাখবে আমরা তোমার আধ মাইলের মধ্যে আছি। তাছাড়া—! আর বললো না সুরঞ্জন। চুপ করে গেল।

উনা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো তারাপুরকে। ছবির মতো

সাজানো তারাপুর। নতুন একটি প্রকাণ্ড বাড়ি দেখিয়ে জিগ্যেস করলো উনা—ওটা কী?

—মেটারনিটি হোম।

—তাও আছে?

—আছে বইকি। ওর পেছনেই তারাপুর ভুবনেশ্বরী হস্‌পিট্যাল। প্রায় পঞ্চাশটা বেড আছে।

—ইলেকট্রিসিটি?

—তাও আছে।

—বাড়িতে নেই কেন?

—লক্ষ্য করোনি তুমি—ওয়্যারিং করা আছে, কিন্তু দিত্নুর বেলোয়ারী ঝাড়ে মোমবাতিই পছন্দ। টানা পাখা প্রেফার করেন।

—অথচ প্রজাদের জন্যে—?

—নিশ্চয়।

—তোমরা সত্যিই অদ্ভুত। আধ মাইলের মধ্যে দুটি জায়গা—একটিতে বিংশ শতাব্দী আর একটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু।

সন্ধ্যার মুখে সুরঞ্জন নামিয়ে দিয়ে গেল উনাকে।

দিন কয়েকের মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। কর্তার পেয়ারের চাকর ভোলা—তারও বয়েস পঞ্চাশের নীচে নয়—অসুস্থ হয়ে দেশে চলে গেল। যাবার সময় তার জোয়ান ভাইপো সত্যেনকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেল। বলে গেল—ছেলেটা একটু মাথামোটা হুজুর। কিন্তু কাজের ছেলে। যদি সেরে উঠি তবেই ছিচরণ দর্শন করবো, নইলে সতে রইলো।

তিন দিনের দিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শোবার জন্য ওপরে উঠলো উনা। ঘরে সর্বদা তালা দিয়ে রাখতো সে। তালা খুলে শীলা আলো হাতে আগে আগে ঢুকলো ঘরে। উনা ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে উঠলো—একি! আমার বিছানার চাদর এমন লাল টকটকে হয়ে গেল কী করে?

—তাইতো বৌরানী! বললো শীলা—আমি তো সেই হালকা আকাশী রঙের বড় চাদরখানা পেতে দিয়েছিলাম আজ সকালে আপনি উঠে যাবার পর। কিন্তু এ তো দেখছি রক্তের মত লাল রঙের চাদর।

দিদিকে ডেকে নিয়ে আয় তো! বললো উনা।

শীলা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল এবং অনুসূয়াকে সঙ্গে করেই ফিরলো।

—কী হয়েছে বৌরানী?

—তুমি আমার বিছানায় চাদর পালটে দিয়েছ?

—বিছানার চাদর? না তো! কী হলো বিছানার চাদরে?

—আমার বিছানায় পাতা ছিল হালকা আকাশী রঙের চাদর—বিকেলেও দেখে গেছি। এখন দেখছি একটা লাল টকটকে চাদর পাতা আছে।

—তোমার ঘর তো তালাবন্ধ থাকে বৌরানী।

—হ্যাঁ।

—তাহলে?

—কী তাহলে?

—দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে কেউ যাতায়াত করে তোমার চাদর পালটে দিয়ে গেল এ তো হতেই পারে না। লাল চাদরই পাতা ছিল তোমার ঘরে।

অধৈর্য গলায় বললো উনা—কিন্তু দিদি তা কী করে সম্ভব? এই তো শীলাও বলছে সকালে আমি উঠে যাবার পর ও চাদর পালটে হালকা আকাশী—

—তার আগে কী রঙের চাদর ছিল? অনুসূয়া শীলার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো।

—হালকা গেরুয়া রঙের চাদর ছিল।

কয়েক সেকেণ্ড শীলার চোখের ওপর চোখ রাখলো অনুসূয়া।

সেই দৃষ্টিতে শীলার বুকের ভেতর অবধি কেঁপে উঠলো।—তুই মিথ্যে কথা বলছিস, না হয় তুই নিজেই বদলে দিয়েছিস!

—না দিদিরানী, আমি সত্যি বলছি, আমি—

—চুপ কর! ধমক দিল অনুসূয়া।—চাদরটা পালটে দে। তারপর উনার দিকে চেয়ে বললে—আমার মনে হয় বৌরানী' ওই লাল চাদরটাই পাতা ছিল, তুমি মনে করতে পারছো না।

—মনে করতে পারছি না মানে?

—হয়তো ভুলে গিয়ে থাকবে। রাত্রিবেলায় লাল রং দেখে তোমার সেই তান্ত্রিকের কাপড়ের রঙের কথা মনে পড়ে গেছে। তাই—। যাই হোক, শীলা পালটে দিচ্ছে, শুয়ে বিশ্রাম করো। একসময় নিশ্চয় মনে পড়বে। এ সময়টায় ভুল হয় সবারই। আমারও হয়েছিল মোহনের বেলায়।

চলে গেল অনুসূয়া। অবাক হয়ে তার যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলো উনা। নতুন একটা খয়েরী রংয়ের চাদর বিছানায় পাততে পাততে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছিল শীলা।

—কী হলো রে? কাঁদছিস কেন?

—কালই আমার চাকরি যাবে বৌরানী। দিদিরানীর চোখের মধ্যে রাগ দেখতে পেয়েছি।

দপ্ করে জ্বলে উঠলো উনা। বললো—না, চাকরি যাবে না। এ আমার বাড়ি, আমার ঘর। এখানে অন্য লোককে যা ইচ্ছে তাই করতে আমি দেব না। কে তোর চাকরি খায় আমি একবার দেখতে চাই।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। পরদিন অনুসূয়া কিছুই বললো না শীলাকে। তীব্র শীত পড়েছে। পৌষ মাসের মাঝামাঝি। রোদ্দুরটুকু ভোগ করবার জন্য বেলা দুটো নাগাদ বেরিয়ে পড়লো উনা, তারপর আস্তে আস্তে দশপীঠের ওই দিকটায় চলতে লাগলো। শীতকালে এখানে সাপখোপের ভয় একদম থাকে না।

তাছাড়া খুব ভেতরে ঢুকে না গেলে এখন আর দিক ভুল হয় না উনার।

ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল উনা। কে করছে? কারা করছে এসব? কেন করছে? চোখের সামনে ঘটছে, অথচ ওরা বলছে সে সব আমার কল্পনা। এর মানে কী? মোহন আছে এর মধ্যে? অনুসূয়া? নাকি আর কেউ?

হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুদূর চলে গেছে উনা। হঠাৎ ডানদিকে চোখ পড়লো তার। দেখলো একটা ভাঙা মন্দিরের চাতালের ওপর বসে বসে তন্ময় হয়ে গল্প করছে মহালক্ষ্মী ও আর একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক। মহালক্ষ্মী উনাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। বললো —কী আশ্চর্য! বৌরানী! এদিকে, এভাবে একা?

—তুমিই বা এদিকে কী করছো ভাই?

—বা বা! আমি তো শীতের দিনের দুপুরবেলায় দশপীঠের মধ্যে বেড়াতে আসি। আমার কতকগুলো বাতিক আছে। আমার মনে হয় এদিক খুঁজলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। এই বলে সে প্রৌঢ়ার দিকে চেয়ে বললো আচ্ছা, তুমি চলে যাও। আমি একাই ফিরবো। স্ত্রীলোকটি চলে যেতে মহালক্ষ্মী বললো—পেয়েওছি আমি। বছর তিন চার আগে একবার একটা পাথরের চাঁইয়ের নীচে আমি একটা সোনার তৈরী ছিন্নমস্তা মূর্তি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সেটা এখন মামা পূজো করেন। চলুন না হাঁটা যাক। কিছুটা হাঁটা ভাল। অবিশ্যি আপনার শরীর যদি—

—না না, আমার শরীর ভালই আছে। চল।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আর কথা বলতে বলতে দশপীঠের অনেক ভেতরে ঢুকে গেল।

—মোহনের সঙ্গে দেখা হয়নি?

—হ্যাঁ। ও তো রোজই যায় আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার পর।

—তাই বুঝি? জানতাম না তো!

—কেন ? সবাই তো জানে !

মুখ টিপে হেসে উনা বললো—তাহলে আমাদের বাড়িতে আসছো কবে ?

তার মানে ?

তার মানে মোহনের বৌ হয়ে আমাদের বাড়িতে এসে পড়ো তাড়াতাড়ি। তাহলে আমিও একজন সঙ্গী পাই, আর মোহনও রোজ সন্ধ্যেয় যাওয়ার হাত থেকে বাঁচে।

হাসলো না মহালক্ষ্মী। বললো—এসব কথা আমি কিছুই জানি না। মামা জানে আর মোহনদা জানে।

একটা জায়গায় গিয়ে দেখলো উনা বড় বড় হলের মত ঘর ছাদ ভাঙা, দেয়াল ভাঙা, কথা বললে প্রতিধ্বনি হয়।

—এদিকটায় কখনো আসেনি।

—এদিকে নাকি দশপীঠে যারা তন্ত্র শিখতে তাদের কলেজ মত ছিল।

কথায় কথায় সম্পত্তির কথা উঠলো। উনা ইচ্ছে করেই মেহন কিছু বলছে কিনা জানবার জন্য প্রশ্ন করলো—আচ্ছা মহা, ধরো আমার যদি বচ্চা না হতো, তাহলে আমার শ্বশুরের সম্পত্তি কে পেতো তুমি জান ?

মহালক্ষ্মী অবাক হয়ে উনার দিকে চেয়ে বললো—একথা আমাকে জিগ্যেস করছেন বৌরানী !

—তুমি কিছু শুনেছ কিনা—

একটু থেমে মহালক্ষ্মী বললো—শুনেছি, আপনার শ্বশুর মোহন-দাকে সম্পত্তি দেবার জন্যে উইল তৈরি করছিলেন—

—সে উইলে আমার জন্যে কী ব্যবস্থা ছিল তুমি জান ?

আবার হাসলো মহালক্ষ্মী। বললো—কী ব্যাপার বলুন তো ? এসব কথা তো আপনি আপনার শ্বশুরমশায়কে কিংবা মোহনদার মাকে জিগ্যেস করলেও জানতে পারতেন। তবু জিগ্যেস করছেন

যখন, তখন মোহনদার মুখে আমি যতটুকু শুনেছি বলছি। আপনার বাচ্চা না হ'লে এই সম্পত্তি মোহনদাকে দিয়ে যাবেন অম্বিকাবাবু। আর সম্পত্তি পাবার আগে কিংবা বিয়ের পর যদি মোহনদার বাচ্চা না থাকে তাহলে এই সম্পত্তি পাবেন—

—কে ? কে পাবেন ? ব্যগ্র গলায় প্রশ্ন করলো উনা।

—সুরঞ্জনদা।

চুপ করলো মহালক্ষ্মী, চুপ করলো উনা। এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন কিছুটা পরিষ্কার হচ্ছে। তাহলে সুরঞ্জনও আছে এর মধ্যে ? হয়তো সেই—! হঠাৎ উনা লক্ষ্য করলো চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে।

—একি ! অন্ধকার হয়ে গেল যে ! ওঠো !

—সাড়ে চারটেয় সন্ধ্যে হয় তো আজকাল। আর একটু বসুন, এক্ষুণি চাঁদ উঠবে। চাঁদের আলোয় আলোয় চলে যাব ছু'জনে। আচ্ছা—কেন এই সম্পত্তির কথা আমাকে জিগ্যেস করলেন বৌরানী ?

—কী জানি মহা, কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে আমার ঘরে। অলৌকিকে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ঘুম ভেঙে একদিন রাত্রে সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে আমার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার পর—

থরথর করে কেঁপে উঠলো মহা। বললো—চলুন বাড়ি যাই।

—তারপর থেকে কত যে কাণ্ড ঘটছে আমার ঘরটার মধ্যে—!

ছু'জনে আবার হাঁটতে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার পাতলা হয়ে চাঁদ উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পরম রহস্যময় হয়ে উঠলো দশপীঠের পরিবেশ। এখানে আলো, ওখানে ছায়া। হাঁটতে হাঁটতে মহালক্ষ্মী বললো—আমরা অনেকটা ভেতরে গিয়ে পড়েছিলাম দেখছি।

—হ্যাঁ। বললো উনা। তার মনের মধ্যে কী রকম একটা

অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। কতদূরে বাড়ি? আর আর এই দশপীঠের শেষই বা কোথায়? যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল উনা, একটু তফাতেই একটা ভাঙা মন্দিরচত্বরের ওপাশ দিয়ে সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছে। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। অস্পষ্ট জড়ানো গলায় চাপা স্বরে বললো উনা—ও কে?

—কই কে? মহালক্ষ্মী বললো।

—ও—ওই তো!

—কোথায়?

—ওই যে! ওই তো দাঁড়িয়ে মন্দিরের ওপাশের জ্যোৎস্নার আলোতে। তুমি দেখতে পাচ্ছো না? ওই দ্যাখ চলে যাচ্ছে।

—কোথায়? মহালক্ষ্মী আবার বললো।

—কী আশ্চর্য! আমি স্পষ্ট দেখছি, তুমি দেখতে পাচ্ছো না কেন?

—কী দেখতে পাব বৌরানী?

—সেই তান্ত্রিক।

মহালক্ষ্মী উনার দিকে চাইলো। তারপর বললো—আপনি দিনরাত ওই কথা ভাবছেন বলে ওই রকম একটা ভিসন্ দেখছেন। আসুন আমরা এইদিক দিয়ে যাই। এই বলে উনার হাত ধরে টানলো মহালক্ষ্মী। —আসুন আমরা এইদিকে যাই।

হঠাৎ একটু দূরে গান শোনা গেল। এইবার মহালক্ষ্মী দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো—কে যেন আসছে এদিক দিয়ে।

বুকের মধ্যে আর পেটের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে উনার।

দেখা গেল পথ দিয়ে পরমানন্দে বেসুরো গলায় গাইতে গাইতে কে একজন আসছে। কাছে এলে দেখা গেল উনাদেরই চাকর, ভোলার ভাইপো সত্যেন। সে দুটি তরুণীকে দেখে থমকে

দাঁড়ালো। তারপর উনাকে দেখে চিনতে পেরে কাছে এসে বললো —এখানে কী করছেন বৌরানী?

সত্যেন! কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—এস্‌তেশেনে। বললো সত্যেন।

আমাকে বাড়ি নিয়ে চল। ক্লান্ত গলায় বললো উনা।

—আসুন!

মহলক্ষ্মী বললো—একে চেনেন তো আপনি বৌরানী?

—হ্যাঁ। আমাদেরই চাকর।

—তাহলে যান ওর সঙ্গে। নাকি আমি যাব আপনার সঙ্গে?

—না ভাই। দরকার হবে না।

আপনি মনটাকে একটু শক্ত করুন বৌরানী! নইলে ক্ষতি হবে।

চলে গেল অন্য দিকে মহালক্ষ্মী।

হ্যালুসিনেসন দেখছি আমি? যেতে যেতে ভাবলো উনা। হ্যালুসিনেসন? সত্যিই কি তাহলে তার মনের ওপর সেই তান্ত্রিকের প্রতিক্রিয়া চলছে? চাঁদের আলোতে গেলেই সেই তান্ত্রিককে সে দেখতে পাবে? নইলে যাকে সে স্পষ্ট দেখতে পেলো তাকে মহালক্ষ্মী দেখতে পেলো না কেন?

পথে আসতে আসতে সত্যেন জিজ্ঞাসা করলো তার মুর্শিদাবাদী ভাষায়—ভয় পেয়্যাছেন নাকি বৌরানী?

—হ্যাঁ রে সতু।

—ক্যানে? কী দেখ্যাছেন মা?

—একজন সন্ন্যাসীকে। লাল কাপড় পরা। জটা···হাতে একটা লাঠি···অথচ আমার পাশে যে ছিল সে দেখতে পেল না।

সত্যেন খুব বিজ্ঞের মতো বললো—হতে পারে। দিষ্টীর ভুল হবে না ক্যানে? হয়। তাও হয়।

রাত্রে শীলা মেঝেতে বিছানা পেতে শোয় আজকাল উনার

ঘরে। শুয়ে শুয়ে উনা দশপীঠের কথাটা বললো শীলাকে। শীলা বললো—কী জানী বৌরানী, আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।

এরপর আর কেউ কোন কথা বললো না। চুপচাপ শুয়েই রইলো—কিন্তু ঘুমোলো না। একটি কথাই ঘুরে ঘুরে উনার কানে বাজতে লাগলো ঃ

মোহনদা না থাকলে কিংবা তাঁর বিয়ের পর ছেলে না হলে সম্পত্তি পাবে সুরঞ্জনদা। সুরঞ্জনদা! সুরঞ্জন। অনেক রাত্তির অবধি পেটে যন্ত্রণাটা ছিল। আস্তে আস্তে কমতে লাগলো। ঘুমের মধ্যেও কী যেন একটা কথা বার বার বিরক্ত করতে লাগলো উনাকে। ঘুম ভেঙে ভেঙে যেতে লাগলো। রাত তিনটে নাগাদ ঘুমটা একেবারে ভেঙ্গে গেল উনার। উঠে আলোটা বাড়িয়ে দিতেই নীচে চেয়ে দেখলো শীলা তারই দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে আছে।

—কী হলো শীলা! তুই ঘুমোসনি?

—আমার বড় ভয় করছে বৌরানী!

—কিসের ভয়?

—কি জানি! কিন্তু মনে হচ্ছে খুব একটা বড় বিপদ এগিয়ে আসছে আমাদের।

—না না, বিপদ আবার কী? কিছু একটা ঘটছে ঠিকই। কিন্তু বেশীদিন ঘটবে না। কেটে যাবে এই দুর্যোগ।

—তাই হোক বৌরানী! সব দুর্যোগ যেন কেটে যায়। আমার বুকের ভেতর খালি কাঁপছে।

ভোরবেলা ডাঃ শীল এলেন বৌরানীকে দেখতে। উনা নীচে নেমে গিয়ে শ্বশুরের ঘরে বসলো। দেখলো ডাঃ শীল বসে আছেন। উনাকে ঢুকতে দেখে বললেন—আসুন বৌরানী। হাউ ডু ইউ ফীল টুডে?

—কোয়াইট্ অল্ রাইট্। থ্যাংক্ ইউ।

—আপনার প্রেশারটা একবার দেখবো।

—দেখুন।

প্রেশারের যন্ত্রে চোখ রেখে পরীক্ষা করতে করতে ডাঃ শীল বললেন—আশ্চর্য ঘটনা!

কী হলো ডাক্তার? অম্বিকা উঠে বসলেন বিছানায়।

—তিন দিন আগে দেখে গেছি, তখন প্রেশার ছিল লো। আজ দেখছি অসম্ভব হাই। আপনি কি মাথায় কোন যন্ত্রণা বোধ করছেন আজকাল?

—না তো!

—দেহের অন্য কোথাও—কোন—?

উনা একটু থেমে বললো—কালকে বেড়াতে বেরিয়ে পেটের মধ্যে একটা যন্ত্রণা ফীল্ করছিলাম।

—ঠিক আছে। আমি কয়েকটা ট্যাবলেট্ দিয়ে যাচ্ছি। এইগুলো তিন ঘণ্টা অন্তর আপনি খেয়ে যান। গোটা দশ পনেরো খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বেশ।

ডাক্তার কতকগুলো বড়ি দিয়ে গেলেন লাল রঙের।

—অসুখটা কী হে বৌমার? অম্বিকা প্রশ্ন করলেন।

—একটু বিচিত্র ধরনের। ওঁর মনের মধ্যে একটা এক্সাইট্‌মেণ্ট চলছে দিনরাত। আচ্ছা আপনি কি কোনরকম হ্যালুসিনেসন ছ্যাখেন বৌরানী?

কোথায় ছিল অনুসূয়া, সেই মূহূর্তে তার গলা শোনা গেল। —হ্যাঁ ছ্যাখেই তো! এইতো কালকেই সন্ধ্যেবেলায় দশ ওদিকে বৌরানী আর মহালক্ষ্মী বেড়াচ্ছিল। এমন সময় একটু দূরে একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে দেখতে পায়। যাকে কিন্তু অনেক বলা সত্ত্বেও মহালক্ষ্মী দেখতে পায় না। তাছাড়া—

—না, ঠিক তা নয়। মহালক্ষ্মী কেন তাকে দেখতে পায়নি, আমি জানি না। কিন্তু আমি তাকে—

—বুঝেছি বুঝেছি। আপনি বড়িগুলো খান, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তার চলে গেলেন। উনা ওপরে উঠে গিয়ে দেখলো শীলা বসে আছে। শীলাকে সে পাঠিয়েছিল তারাপুরে সুরঞ্জনের কাছে একটা খবর দিতে। শীলা বললো – উনি আজ তিন দিন কোলকাতায় গেছেন।

—কোলকাতায় কেন ?

—তা তো বলতে পারবো না বৌরানী। তবে শুনলাম উনি জমিদারির কী একটা জরুরী কাজে কোলকাতা চলে গেছেন। পরশু নাগাদ ফিরবেন এমন কথা আছে। একটু থেমে শীলা ডাকলো – বৌরানী !

—কী রে ?

—আমি আজ দেখেছি।

—কী দেখেছিস ?

—সেই সন্ন্যাসীকে। আমি খুব ভোরে যখন দশপীঠের মধ্যে দিয়ে তারাপুরে যাচ্ছিলাম সেই সময় দেখলাম দূরে একজন সন্ন্যাসী থামের আড়ালে লুকোলেন আমাকে দেখে।

মনের আনন্দে ছুটে গিয়ে শীলাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলো উনা। বললো—তুই আমাকে বাঁচালি শীলা ! তুই আমার প্রাণ দিলি আজ ! ভাবছিলাম আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।

এই বলে বড়িগুলো বার করে বললো উনা—শীলা, এক গ্লাস জল দে তো।

জল নিয়ে এসে শীলা যখন শুনলো যে এই বড়ি ডাক্তার দিয়ে গেছে, তখন সে এক কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ উনার

হাত থেকে সমস্ত বড়িগুলো কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ফেলে দিয়ে যখন সে দেখলো উনা একদৃষ্টে তার দিকে চুপ করে চেয়ে আছে, তখন সে কাঁদতে আরম্ভ করলো। অনেকক্ষণ পরে উনা উঠে দাঁড়ালো। তারপর এগিয়ে গিয়ে শীলার গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর শান্ত গলায় বললো—শীলা, আজ বুঝতে পারলাম, এ বাড়িতে তুই আমার একমাত্র বন্ধু। যে কথাটা আমার কিছুতেই মনে পড়ছিল না, তুই বড়িগুলো ফেলে দেবার পর সেটা মনে পড়লো।

সেই দিন রাত্রে আবার একটা ঘটনা ঘটলো। তালা খুলে ঘরে ঢুকে উনা দেখলো তার ঘরে কেউ ঢুকেছিলো। প্রথমতঃ বিছানার পাশে দেওয়ালে তার আর চন্দ্রচূড়ের গ্র্যাণ্ড হোটেলে তোলা যে ছবিটা টাঙানো ছিল সেটা নেই,—দ্বিতীয়তঃ তার মাথার বালিশটা বদল হয়ে গেছে। শীলাও উনারই সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল। তার দিকে চেয়ে রেগে আগুন হয়ে বললো উনা—ডাক তো চাকরবাকরদের। আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত করবো।

সঙ্গে সঙ্গে শীলা এগিয়ে এসে উনার হাত ধরে বললো—দোহাই বৌরানী, আপনি একটুও চীৎকার করবেন না! যারা এসব করছে, তারা চাইছে আপনি চেঁচামেচি করুন, তাতে তাদের সুবিধে হবে। যেন কিছুই হয়নি আপনি এইভাবে চলুন।

আরো চার দিন কেটে গেল।

শীত পড়েছে ভীষণ। ভোরবেলায় উঠে যথারীতি উনা শ্বশুরের ঘরে গিয়ে দেখলো তিনি গীতা পড়ছেন। বললেন—এসো মা। বোসো।

উনা শ্বশুরের কাছে বসলো। অম্বিকা উনার মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে বললেন—সব ভুল হয়ে যাচ্ছে, না মা?

—কই না তো বাবা! অবাক হয়ে জবাব দিল উনা।

—এই সময়টায় একটু এরকম হয়। কয়েকটা দিন মন দিয়ে

চিকিৎসা করলে আবার সেরে যায়। ঠিক আছে—কোন ভয় নেই। সেরে যাবে।

ঠিক সেই সময় দরজা দিয়ে ডাঃ শীল ঢুকলেন। তিনি উনার দিকে চেয়ে বললেন—আপনি যদি আমাকে হেল্‌প না করেন বৌরানী তাহলে আমি আপনাকে কী করে সারিয়ে তুলি বলুন তো?

উনা চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে।

—কী হয়েছে? জিগ্যেস করলেন অম্বিকা।

ওঁকে যে বড়িগুলো খেতে দিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো উনি খাননি। এই দেখুন বাগানের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে দুটি বড়ি কুড়িয়ে পেলাম।

অম্বিকা সস্নেহে উনার দিকে চেয়ে বললেন—কেন মা বড়িগুলো খাওনি?

—আমার কিছু হয়নি বাবা।

—সেইখানেই রোগ। দেখুন, বৌরানী, আপনাকে সারিয়ে তোলা আমার মহান ব্রত? আপনি সাহায্য করুন আমাকে।

—আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কোনই অসুখ করেনি। এই বলে উনা ঘর থেকে চলে গেল।

নিরুপায় হয়ে অম্বিকা ভুবনেশ্বরীকে ডেকে পাঠালেন ভুবনেশ্বরী এলেন না। কিন্তু চিঠি লিখে পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল—

কল্যাণীয়েষু,—

অম্বি, বুদ্ধিমান তুমি কোনদিনই ছিলে না তাহা জানি। কিন্তু এতটা বোকা ইহা জানিতাম না। আমার যাইবার কোন দরকার নাই বলিয়া আমি মনে করি। তাই তোমাকে বলিতেছি শ্রীমতী বধূমাতাকে এইভাবে বিরক্ত করার সুযোগ দিও না। তুমি নিজে উঠিয়া দাঁড়াও এবং নিজের বংশের সর্বশেষ অবলম্বনটুকুকে রক্ষা করো। উনার কিছুই হয় নাই।

আশীর্বাদিকা

ভুবনদিদি।

অম্বিকা চিঠি পড়ে হতভম্বের মতো বসে রইলেন। এই চিঠির কোন অর্থই তাঁর বোধগম্য হলো না।

পরদিন বিকেলবেলায় ঝড়ের বেগ শীলা ঢুকলো ঘরে। বললো —বৌরানী, আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?

বেলা তিনটে বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। একটু আগেই ঘুমটা ভেঙেছে। শীলার দিকে চেয়ে বললো—তার মানে?

—দিদিরানী আমাকে বললেন আপনার বাক্সটা গুছিয়ে দিতে।

—কেন?

—তা জানি না। তবে আমাকে বললেন অপনার বাক্স গুছিয়ে দিতে।

—সেকি! বলে উনা দেখলো ঠকঠক করে কাঁপছে শীলা।

—কী হলো রে? বলে উনা উঠে গিয়ে ধরলো শীলাকে। সঙ্গে সঙ্গে শীলা ভেউ ভেউ করে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলো। বললো—ওরা আপনাকে পাগল বলে রাঁচীতে নিয়ে যাবে বৌরানী। আমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি আর একটুও দেরি করবো। না। বৌরানী—আমি—। কথা শেষ না করে শীলা ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এতক্ষণে পুরো ঘটনাটা বুঝতে পারলো উনা। কেন এই তান্ত্রিক, কেন চাদর বদলানো, বালিশ বদলানো, কেন মহালক্ষ্মীর দেখেও 'দেখিনি' বলা। মহালক্ষ্মী সাহায্য করছে মোহনকে। ভয় পেয়ে আমার গর্ভের সন্তান যখন মরলো না, তখন রাঁচীর পাগলা-গারদে রেখে আমাকে শেষ করবে এরা। ডাঃ শীলকে আনা হয়েছে এই ষড়যন্ত্রে সাহায্য করতে।

কিন্তু আর তো এক সেকেণ্ড দেরি করা যায় না। এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে, এখুনি পালিয়ে যেতে হবে এ বাড়ি থেকে। তাড়াতাড়ি শাড়িটা পালটে নিয়ে, হাতব্যাগটায় কিছু টাকা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো উনা। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

হলে পৌঁছতেই দেখতে পেলো হলের মধ্যে ডাঃ শীল, অনুসূয়া, মোহন, মহালক্ষ্মী—আরো চার পাঁচজন লোক বসে আছে।

তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো উনা। ডাঃ শীল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন —আপনি কোথায় যাচ্ছেন বৌরানী ?

—সে কৈফিয়ত আপনাকে দেব না। বলে এগোতেই মোহন উঠে পথ আটকালে। বললো—পাগলামি করো না ছোটমামী। তোমাকে এখুনি আমরা নিয়ে যাব চিকিৎসার জন্যে।

—অর্থাৎ জোর করে পাগল বানাতে চাও ? সম্পত্তিটা তোমার চাই, আমাকে আগে বলোনি কেন ? বললে সে ব্যবস্থা আমি নিজেই করতাম। তোমাদের এত কষ্ট করা—এত বুদ্ধি খরচ করার কোন্ দরকারই হতো না।

গাড়ি এসে লাগলো বাইরে। মোহন মহালক্ষ্মীকে বললো—তোমার মামা কোথায় ? তিনি যে মন্ত্র পড়বেন মামীর যাবার সময়—তার কী হলো ?

—তিনি তো অনেকক্ষণ বেরিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে মহা বললো।

অনেক চেষ্টা করলো উনা। কিন্তু এদের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারলো না। সবাই মিলে জোর করে ধরে উনাকে গাড়িতে তুললো। গাড়ি যখন ছাড়ছে তখন উনার কানে এলো অম্বিকার চীৎকার :

আরে, আমার দরজায় শেকল তুলে দিয়ে গেল কে ? ওরে ! কে আছিস্ ! দরজাটা খুলে দে ! সতে !

গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ির মধ্যে উনাকে চেপে ধরে বসে আছে একদিকে মোহন, আর একদিকে অনুসূয়া !

স্টেশনে আজ অনেক লোক। স্টেশন মাস্টার বেরিয়ে এলেন। বললেন—নিশ্চয় আরোগ্য হয়ে ফিরে আসবেন বৌরানী ! কিছু ভয় নেই।

—সেই কথাই তো তখন থেকে বোঝাচ্ছি মাস্টারমশায়। বললো অনুসূয়া।— কিন্তু কিছুতেই শুনছে না।

—না না, লক্ষ্মী মেয়ের মত চলে যান। এখুনি গাড়ি আসবে। আজ ভিড়ও খুব বেশী।

স্তব্ধ হয়ে গেছে উনা। আর যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই। ছেড়ে দাও নিজেকে এদের হাতে। এরা তোমার সন্তানকে হত্যা করবে—করতে দাও এদের। বাধা দিয়ো না। কেউ জানবে না উনা কোথায় গেল। পৃথিবীর কেউ জানবে না। আশ্চর্য! সুরঞ্জনও যদি থাকতো এসময়? কেউ নেই!

গাড়ি আসার ঘন্টা পড়লো। উনাকে ধরে ওঠাবার চেষ্টা করতেই সে বললো—ধরাধরি করতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি। এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে চলতে লাগলো…

গাড়ি এসে দাঁড়ালো। মোহন লাফিয়ে উঠে একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরার দরজা খুলে দিয়ে বললো—ছোটমামীর বাক্সটা আগে দাও।

উনা গাড়িতে ওঠবার জন্য পাদানিতে পা দিয়েছে এমন সময় শোনা গেল ঃ

এত উৎসাহ দেখিয়ে লাভ নেই মোহন, নেমে এসো। এ গাড়িটা ফেল্ করো।

—তার মানে? তুমি কী বলছো সুরোদা? তুমি জান ছোটমামীর অসুখটা কী রকম সিরিয়াস!

—জানি। তার চাইতেও সিরিয়াস অসুখ তোমাদের। এসো নেমে এসো।

নেমে এলো শুকনো মুখে মোহন। পেছন থেকে শোনা গেল ঃ পালাবার চেষ্টা করবেন না ডাক্তারবাবু। এখানে যারা আছে কেউ যাত্রী নয়—সবাই পুলিস।

হঠাৎ দেখা গেল বাঘিনীর মতো এগিয়ে এলো অনুসূয়া। সুরঞ্জনের দিকে আগুনভরা দৃষ্টিতে চেয়ে বললো—এসব কী বাঁদ-রামি হচ্ছে ? সুরো ? বৌরানীর অসুখটা কী তা কি তুই জানিস ?

—জানি মাসী। সংঘাতিক অসুখ। এ গাড়িটা ছেড়ে দাও, যদি তোমাদের পাপে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে না যায় তাহলে ট্রেন আরো আসবে। তখন যাওয়া যাবে।

ডাঃ শীল এগিয়ে এসে বললেন—আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু আমি এই রোগীর ফিজিসিয়ান। আপনার এই হস্তক্ষেপের জন্যে যদি এঁর কোন ক্ষতি হয় তবে তার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী হবেন আপনি।

—হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো অথরিটি সঙ্গে করেই এনেছি মশায়। আমার পাশে এই যে যুবকটিকে দেখছেন ইনি আপনার রোগীকে যেখানে পাঠাচ্ছিলেন সেখানকার মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। এবং প্রধান চিকিৎসক। আপনি এরই কাছে সিট পাবার দরখাস্ত করে-ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। কালীপুরের নাম দেখে উনি তারাপুরে আমাকে চিঠি লিখে কেসটার ডিটেল্‌স্ জানাতে বলেন। আমি ওঁকে চলে আসতে লিখি। আপনি এঁর কাছে এবার বলবেন আপনি কোত্থেকে পাস করেছেন, মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে কেন আপনি বৌরানীকে অ্যবরশনের ট্যবলেট্ খেতে দিয়েছিলেন—ইত্যাদি।

গাড়ি ছেড়ে দিল। মোহন পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো। সবাইকে থানার দিকে যেতে বলে সুরঞ্জন দেখলো উনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। সে লাফিয়ে গিয়ে ধরে ফেললো উনাকে।

থানায় গিয়ে দেখা গেল সেখানে বাড়ির চাকর সত্যেন গোকুল চক্রবর্তীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে বসিয়ে রেখেছে।

—কী ব্যাপার সতু ?

এই যে মহাপ্রভুকে ধরে ফেলেছি সুরঞ্জন। আমি যে ছায়ার মতো ওঁকে লক্ষ্য করেছি তা তো জানতেন না। উনি আজকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দশপীঠের ভেতর দিয়ে বৌরানীর দোতলার কোণের শোবার ঘরে উঠে আসেন, তারপর সেখানে থেকে তান্ত্রিকের পোশাক চুল লাঠি ইত্যাদি নিয়ে আবার দশপীঠের মধ্যে নেমে আসেন। সেখানে বসে সেগুলি পোড়াবার চেষ্টা করতেই আমি হাজির। প্রথম তো হারামজাদা শূয়ারের বাচ্চা ইত্যাদি হলো, তারপর একটা ছোরা বার করলেন! অবিশ্যি পারলেন না।

উনা অবাক হয়ে এতক্ষণ সত্যেনের কথা শুনছিল। এইবার বললো—তুমি চাকর নও?

—না বৌদি। হেসে বললো সত্যেন।—কোলকাতা ইন্‌টেলিজেন্সের একজন অফিসার। সুরঞ্জন আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। ও অনেক আগে আমাকে একটা কন্‌স্পিরেসির আভাস দিয়েছিল। হ্যাঁ, ভাল কথা গোকুল চক্রবর্তী কনফেস্ করেছে।

—কিসের কন্‌ফেশন?

—সূর্যবাবুকে আর চন্দ্রচূড়কে উনিই খুন করেছেন। অবিশ্যি ওঁকে সাহায্য করেছেন অনুসূয়া দেবী এবং মোহনবাবু।

পাশের ঘরে রাঁচীর মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঘটক কথা বলছিলেন ডাঃ শীলের সঙ্গে। এবার বেরিয়ে এসে বললেন—হি ইজ এ চিট্। ডাক্তার নয়, কম্পাউণ্ডার ছিল। হি মাস্ট বি অ্যারেস্‌টেড্।

গাড়িতে করে থানায় এসে পৌঁছলেন অম্বিকাপ্রসাদ। গোকুল চক্রবর্তীর তখন অর্ধউন্মাদ অবস্থা। তিনি বিড়বিড় করে বকছেন—পারলাম না। তীরে এসে তরী ডুবে গেল, দাদু কথা রাখতে পারলাম না। ক্ষমা করো।

যেমন বিচিত্র, তেমনি অদ্ভুত গোকুলের ষ্টেটমেণ্ট। অম্বিকা-

প্রসাদের প্রপিতামহরা তিন ভাই ছিলেন। ছোটভাই বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে অবৈধে সংসর্গে লিপ্ত আছেন এবং অবৈধভাবে তার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন বলে তার পিতা চাবুক মেরে ক্ষতবিক্ষত করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর নাতিকে এই কাহিনী বলেন। এবং আদেশ করেন—যদি ওই বংশকে নিবংশ করে ওই রায়-মঞ্জিলের কোনদিন মালিক হতে পারে তাঁর নাতি, তবে তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে। কুড়ি বছর বয়সে গোকুল এখানে আসে এবং রায়বাড়ির পৌরোহিত্য গ্রহণ করে। তান্ত্রিকের ভয় এই পরিবারের রক্তের মধ্যে। তিনিই তান্ত্রিক সেজে সূর্যকে এবং চাঁদকে ঘুমন্ত অবস্থায় ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে গোল বারান্দা থেকে নীচে ফেলে দেন। নিজের আসল পরিচয় দিলে পাছে অম্বিকা তাঁকে তাড়িয়ে দেন, সেইজন্য তিনি স্থির করেছিলেন নিজের ভাগ্নীর সঙ্গে মোহনের বিয়ে দিয়ে রায়মঞ্জিলের অধিকার নেবেন। তাঁর নাম গোকুল চক্রবর্তী নয়,—আসল নাম ভৈরবীচরণ রায়।

বিচারে ফাঁসির অর্ডার হলো গোকুলের। জেল হলো অনুসূয়া ও মোহনের। কোর্ট থেকে অর্ডার হলো—জেলভোগের পর মাতা পুত্র রায়মঞ্জিলে আর ঢুকবেন না। অন্যত্র চলে যাবেন।

এর দু'মাস পরে আড়াআড়িভাবে মারা গেলেন অম্বিকা আর ত্র্যম্বক দুই ভাই। উনা এসে বাস করতে লাগলো তারাপুরে। অত বড় বিশাল বাড়িতে একা থাকা সম্ভব নয়।

নক্ষত্র জন্মগ্রহণ করলো। তার অন্নপ্রাশনের দিন অসুস্থা ভুবনেশ্বরীকে বললো সুরঞ্জন—দিদু, তোমার তো ইচ্ছে ছিল রায় বাড়ি আর চৌধুরী বাড়ি এক হোক।

—হ্যাঁ। বললেন ভুবনেশ্বরী।

—তাহলে আমি আর বিয়ে করলাম না দিছু। ওই নক্ষত্রকেই দুজনে মিলে মানুষ করি। কী বলো?

—ওরে হতভাগা, ও যে তোর মামী!

—মামী মামীই থাক—আমি আমিই থাকি। কিন্তু নক্ষত্র একটি—অনেক মেঘ। দুজনে চেষ্টা না করলে তো ওটাকে রাখা যাবে না।

—তাই হোক সুরো। তাই হোক। বলে পাশ ফিরে শুলেন ভুবনেশ্বরী। দেখা গেল দু'চোখ দিয়ে জল ঝড়ে ঝড়ে বালিশটাকে ভেজাচ্ছে শুধু···।

—সমাপ্ত—